উপন্যাস সিরিজ: Tree of Magic
পার্ট ১: ক্রিস্টাল অফ অ্যাথারিয়াম
লেখক: মাহমুদুল হাসান

অধ্যায় ১:

নুরআলমপুর।
বালুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট গ্রাম, যেখানে আকাশ ধূলিভরা এবং বাতাসে পুড়ে যাওয়া তারার গন্ধ। সূর্যটা তখন দিগন্ত ছুঁয়ে নামছিল, আর আকাশ লালচে রঙে আঁকা ছিল—যেন কেউ আগুন মাখিয়ে দিয়ে গেছে আকাশের ক্যানভাসে।
পনেরো বছরের কদির হাঁটছিল চুপচাপ, পায়ের নিচে কাঁপছিল ধূলিধরা বালি। তার চোখে ক্লান্তি, কিন্তু তাতে ছাপা ছিল একটা ভেতরের চাপা দহন। তিনদিন ধরে নিখোঁজ তার চাচা সাঈদ—এই গ্রামের একজন অদ্ভুত মানুষ, যার চোখে ছিল হাজার রহস্যের গল্প।
চাচা সবসময় বলতেন,
"এই বালুর নিচে সত্য লুকায়। শুধু যারা খোঁজে, তারাই খুঁজে পায়।"
আর কদির… সে খুঁজে বের করতে চায়।
চাচার ঘরটা গ্রামের এক কোণে, পুরনো খেজুরগাছের পাশে। বাকি ঘরগুলোর চেয়ে আলাদা—দেয়ালে ঝুলে থাকা পুরনো মানচিত্র, রহস্যময় প্রতীক আঁকা দরজা, আর কাঠের মেঝেতে ঘষা লেগে যাওয়া গোল এক দাগ, যেন কেউ বারবার কোনো কিছুকে টেনে তুলেছে সেখানে।
কদির ধীরে ধীরে সেই ঘরের নিচে নেমে আসে। সেখানে আছে এক গুপ্ত কক্ষ—যেটা কেবল চাচা আর কদির জানে।
মাটির নিচের ঘরটা ঠান্ডা, ধুলোমাখা, আর কুয়াশাভরা। দেয়ালে ঝুলে আছে পুরনো বইয়ের তাক, কিছু অদ্ভুত যন্ত্র, আর এক কোণে একটা ছোটো কাঠের বাক্স।
বাক্সটা খুলতেই দেখা গেল এক নীলাভ আলো ছড়ানো পাথর। না, এ কোনো সাধারণ পাথর নয়। এর গায়ে সূক্ষ্ম দাগ, যেন জ্যামিতিক ছাঁদে কাটা, মাঝে মাঝে জ্বলজ্বল করে ওঠে হালকা সবুজ আভা।
কদির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।
সে জানে না এটা কী।
সে জানে না এটাতে কী আছে।
সে শুধু জানে—এই পাথরটা তার চাচার থেকেও বেশি চুপচাপ।
হঠাৎ সে খেয়াল করল, পাথরের নিচে একটা কাগজ। এটা একটা চিঠি।
চিঠি (সাঈদের হাতে লেখা):
> _“যদি আমি আর ফিরে না আসি, তবে তুমি এই বাক্স খুলছো ঠিকই… কদির।
আমার সময় শেষ। আমি অনেক খুঁজেছি, অনেক প্রশ্ন করেছি। কিছু উত্তর পেয়েছি, কিছু পাইনি।
এই পাথরটা—এটা কেবল পাথর নয়। এর ভেতরে কিছু আছে। আমি জানি না এটা কি চায়, তবে এটা ‘চায়’।
তুমি সাহসী। কিন্তু জেনে রেখো—সব প্রশ্নের উত্তর জানা মানেই শান্তি নয়।
সময় এলে—নিজেই বুঝবে।”_
চিঠির নিচে কোনো স্বাক্ষর নেই।
শুধু একটা প্রতীক আঁকা—তিনটি বৃত্ত, একে অপরকে ছুঁয়ে থাকা, আর মাঝখানে এক বিন্দু।
কদির ধীরে ধীরে পাথরটির দিকে হাত বাড়াল।
আঙ্গুল স্পর্শ করতেই, মুহূর্তেই ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল।
কোনো শব্দ নেই।
বাইরের বাতাস থেমে গেছে, বইয়ের পাতাগুলো নড়ছে না, এমনকি কদির নিজেই শুনতে পারছে না নিজের নিঃশ্বাস।
তারপর…
একটা মুহূর্ত…
একটা কাঁপুনির মতো অনুভব…
তারপর… কিছুই না।

আবার শব্দ ফিরল—হাওয়া ফিরল, দূরে কোন পাখি ডাকল। কিন্তু কদির স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দেহে স্রোতের মতো কিছু বয়ে গেল, চোখে বিস্ময়।
সে জানে না কী ঘটল।
সে জানে না, এই পাথরটা আসলে কী।
সে জানে না, এই মুহূর্তে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে।
> আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আর নুরআলমপুরের বালির নিচে… কোনো এক সত্তা, ধীরে ধীরে চোখ খুলছিল।

অধ্যায় ২:

নুরআলমপুরের আকাশে আজ কিছু অস্বাভাবিক।
সূর্য উঠে গেছে, কিন্তু বালুর মাঝে জমে আছে অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা। কদির সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন ক্রিস্টালটাকে আবার দেখে, তখন সেটা তার নিজের মতোই স্তব্ধ, কিন্তু সে জানে — গত রাতে কিছু হয়েছিল।
অদৃশ্য কিছু।
ভয়ের মতো নয়, বরং গভীর কিছু… যেটার ভেতরে কোনো ডাক ছিল।
কদির আজ সকালে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আবির-এর কাছে যায়। আবির হল তার বয়সী, কিন্তু অনেক বেশি যুক্তিবাদী, কৌতূহলী আর ঠান্ডা মেজাজের।
কদির পাথরের গল্প বলে না সরাসরি। সে বলে—
“চাচার ঘরে একটা জিনিস পেয়েছি… একটু অন্যরকম।”
আবির চোখ সরু করে বলে, “তুই আবার কল্পনা করছিস না তো? গতবার বলেছিলি চাচা টাইম ট্রাভেল করতে পারত।”
কদির হেসে মাথা নাড়ে। তারপর ব্যাগ থেকে পাথরটা বের করে।
নীলাভ সেই পাথর।
যেটা এখন হালকা সবুজ আভা ছড়াচ্ছে… দিনের আলোয় তা আরও অদ্ভুত।
“এটা কি?”—আবির মুগ্ধ।
“চাচার বাক্সে ছিল। আর… এটা আমি স্পর্শ করতেই ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সব থেমে গেছিল।”
আবির কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে,
“আমরা এটা টেস্ট করে দেখতে পারি।"
“কীভাবে?”
“পুরনো পাহাড়ঘেরা গুহায় যাই। সেখানে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক কিছু ডিটেক্ট করার ডিভাইস আছে আমার।”
কদির মাথা নাড়ে।
হ্যাঁ, গুহা হবে সঠিক জায়গা—মানুষের চোখের বাইরে। আর তার ভেতরে, পাথরের রহস্য হয়তো খুলে যাবে।
এদিকে, নুরআলমপুর থেকে বহু বহু দূরে… এক ভিন্ন মাত্রার ঘোলাটে অন্ধকার ঘরে, একটা ছায়ারূপ জেগে উঠছে।
তার চোখ নেই, কিন্তু সে দেখতে পায়।
তার মুখ নেই, কিন্তু সে শ্বাস নেয়।
তার নাম: স্টোভাটর।
ডার্ক এনার্জির গাঁথা এক সত্তা।
সে এখন এক জায়গায় বসে, এক মহাজাগতিক কুয়াশার ভেতর হাত ছুঁড়ছে। এবং সেই ছোঁয়ার ভেতর তার সামনে ভেসে উঠছে এক ছবি—
এক পাথর।
নীলাভ আলোয় ঘেরা।
“অ্যাথারিয়াম…” — স্টোভাটরের ভেতর ফিসফিস করে এক ছায়ামুখ।
“তুই শেষ পর্যন্ত… রূপ নিয়েছিস। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা… যখন আমি এই পাথর আর আমার ডার্ক এনার্জিকে একত্র করব… তখন মহাবিশ্বের সব জাদুকরী সত্তার উপর আমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে।”
তার চারপাশে অন্ধকার তরল নড়তে শুরু করে। ছায়ার ভেতর থেকে এক অদৃশ্য সেনা তৈরি হচ্ছে—কল্পনার বিপরীত, এক অ্যান্টি-কল্পনার বাহিনী।

স্টোভাটর জানে, পাথরটা এখনো ঘুমন্ত।
তবে সেই কিশোর—কদির—হচ্ছে পাথরের নতুন বাহক।
এবং সে বুঝে গেছে, তাকে এখনই থামাতে হবে না।
কারণ কিশোরের ভেতর এখনো ভয় আছে।
আর ভয়, হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।
কদির ও আবির এখন পাহাড়ি গুহায়।
ডিভাইস অন করতেই আবির চমকে ওঠে—
“এটা তো... এক ধরণের কসমিক ফ্লাক্স রেডিয়েশন! এত বেশি শক্তি সাধারণ কোনো বস্তু থেকে বের হতে পারে না।”
হঠাৎ পাথরটা ধীরে ধীরে ঘূর্ণন শুরু করে, বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।
এক মুহূর্তে পাথর থেকে সাদা ফোটনের ঝলক বেরিয়ে আসে—হাতের তালুতে থাকা পাথরটা যেন ভেতর থেকে আকাশের মতো জ্বলে উঠছে।
কদির চমকে উঠে পাথরটা ফেলে দেয়...
সেই আলো ছড়িয়ে যায় চারপাশে, আর বাতাসে কিছুর গন্ধ ভেসে আসে—জ্বলন্ত নক্ষত্রের মতো গন্ধ।
কিছুই আর আগের মতো নয়।
পাথরটা ধীরে ধীরে আবার স্থির হয়।
কিন্তু কদির এখন জানে—এটা কেবল একটি বস্তু নয়।
সে জানে না এটা কী
সে জানে না কে এটা চায়
সে জানে না সে নিজে কেন এটা পেয়েছে
কিন্তু সে জানে—অদ্ভুত কিছু শুরু হয়েছে।
> দূরের আকাশে, এক কালো রেখা জেগে উঠল। যেন অদৃশ্য কারো চোখ এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

অধ্যায় ৩:

পাহাড়ি গুহা এখন নিস্তব্ধ।
আবির ধীরে ধীরে হাঁপাচ্ছে, চোখে ভয় আর বিস্ময় মিশে আছে।
কদির কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।
পাথরটা পড়ে আছে সামনে—স্থির, কিন্তু যেন ঘুমের মধ্যে শ্বাস নিচ্ছে।
“এই জিনিসটা... জীবন্ত।” আবির ফিসফিস করে।
কদির পাথরের দিকে এগিয়ে যায়।
তখনই পাথরের কেন্দ্র থেকে এক সাদা রেখা বের হয়ে দেয়ালের দিকে ছুটে যায়।
সেই রেখা দেওয়ালে যেন ছবি আঁকে—একটা আকার... একটা আকৃতি...
কিছু সময় পরে, সেই আকার জীবন্ত হয়ে উঠল।
দেওয়াল থেকে যেন ধীরে ধীরে গলে নেমে আসে এক প্রাণী।
তা দেখতে কিছুটা বাঘের মতো, কিন্তু গায়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো আবরণ। তার চোখ দুটো জ্বলছে গাঢ় নীল আলোয়।
শরীরে এক ধরণের জ্যোতির্ময় ফোটনের প্রবাহ।
আবির পেছনে সরতে যায়, কিন্তু কদির দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাণীটা তার দিকে তাকায়।
কোনো শব্দ নেই।
হঠাৎ সে কদির সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে।
“ওহ মাই গড... এটা তো তোকে স্যালুট করছে!” —আবির বলে ওঠে।
কদির ধীরে ধীরে হাত বাড়ায়... প্রাণীটা তার মাথা নিচু করে দেয়।
তার স্পর্শে প্রাণীর শরীর থেকে হালকা এক শক্তির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, যেন একটা ফোর্স ফিল্ড চারপাশে তৈরি হয়।
এক মুহূর্তের জন্য, চারপাশের গুহা থেমে যায়।
“তুই... এটা তৈরি করেছিস?”—আবির অবাক হয়ে বলে।

“না… আমি কিছু করিনি,”—কদির ধীরে উত্তর দেয়।
প্রাণীটা হঠাৎ গলা থেকে একটা শব্দ তোলে—খুব হালকা, যেন কোনো সুরেলা ঢেউ।
একটা নাম তার মাথায় ভেসে আসে—
"লুমিয়র"
কদির ফিসফিস করে বলে ওঠে, “তোর নাম লুমিয়র…”
আবির বলে, “তোর মাথায় কিভাবে এলো?”
“জানি না। যেন ওর কাছ থেকেই শুনলাম।”
এই সময়, অন্য এক মাত্রায়…
স্টোভাটর কিছু অনুভব করে। তার অন্ধকার সেনাদের মাঝে সে দাঁড়িয়ে বলে—
“প্রথমটি জেগে উঠেছে।”
তার ডান হাতে ডার্ক এনার্জির ঘূর্ণি জমা হয়, যেন সে কিছু পাঠাতে যাচ্ছে।
“সে জানে না, এই প্রতিটি প্রাণী, এই প্রতিটি আলোর তৈরি অস্ত্র… আমাকে আরও কাছে আনছে।”
তার হাত থেকে বেরিয়ে যায় এক অন্ধকার বিন্দু।
নিশানা একটাই: কদির।
গুহার বাইরে এসে কদির ও আবির দেখতে পায়—লুমিয়র তাদের পেছনে পা ফেলছে একদম নিঃশব্দে।
তারা তিনজন এখন আর শুধু কিশোর ও পাথরের বাহক নয়।
তারা এক নতুন যাত্রার শুরুতে। আর এই শুরু শুধু গল্পের, নয়—এক মহাবিশ্বের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের।
> পেছনে অদৃশ্য বালুর মাঝে, এক বিন্দু অন্ধকার জন্ম নিচ্ছে—যা কোনো আলোকে ভয় পায় না

অধ্যায় ৪:

পাহাড়ি গুহা থেকে ফিরে আসার সময়, কদির আর আবির খেয়াল করল—বাতাস ভারী।
লুমিয়র নিঃশব্দে তাদের পাশে হাঁটছে। তার চোখে সতর্ক দৃষ্টি, যেন সে অদৃশ্য কিছু অনুভব করছে।
পথ ফুরিয়ে আসার আগে আবির থেমে দাঁড়ায়।
"তুই কিছু শুনলি?"
কদির মাথা নাড়ে—“না, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু আমাদের অনুসরণ করছে…”
আকাশ অস্বাভাবিক কালো হয়ে উঠেছে, যেন দিন দুপুরেও কেউ আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।
বালুর মধ্যে ধীরে ধীরে এক অন্ধকার জমা হতে থাকে।
শুরুতে সেটা একটা ছোট কালো বিন্দু—তারপর তা বিস্তৃত হতে হতে আকার নেয় মানুষের ছায়ার মতো, কিন্তু তার শরীর দুলছে, যেন বাষ্প দিয়ে গড়া।
কদির পিছিয়ে যায়।
আবির চিৎকার করে ওঠে—“ওটা… ওটা ছায়া না! ওটা বাঁচে!”
ছায়া-পিশাচের মতো সেই সত্তা মুখহীন, চোখহীন, কিন্তু ঠিক কদিরের দিকে এগিয়ে আসে। তার চারপাশ থেকে এক ধরণের ডার্ক এনার্জি বের হচ্ছে—হাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে দুঃস্বপ্নের গন্ধ।
হঠাৎ লুমিয়র দাঁড়িয়ে যায় সামনে, গর্জন করে।
তার শরীর থেকে ঝলকে বের হয় এক ফোটন বল—উজ্জ্বল সাদা আলো।
ছায়া পিছু হটলেও আবার গঠিত হয়—এই সত্তা সাধারণ কিছু নয়।
“লুমিয়র, সাবধান!”—কদির চিৎকার করে।
ছায়া হঠাৎ লাফিয়ে এসে কদিরের দিকে ছুটে আসে, কিন্তু লুমিয়র তার সামনে ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে দেয়।
ধাক্কা!
আকাশ কাঁপে। চারপাশে বালি উড়ে।
কদির বুঝতে পারে—সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খাবে।
তাকে কিছু করতে হবে।
সে আবার পাথরটা বের করে।

ক্রিস্টালটি এখন আরও উজ্জ্বল—তার শরীরে একপ্রকার কম্পন জন্মায়।
কদির মনে মনে ভাবে—“যদি এটা কিছু করতে পারে... এখন কর!”
পাথরটা তার হাতে সাড়া দেয়।
এক ঝলক সাদা আলো বের হয় তার বুক থেকে, আর সেই আলো ছুঁয়ে যায় লুমিয়রকে।
লুমিয়রের শক্তি যেন বেড়ে যায়—তার গায়ে স্ফটিক বেড়ে ওঠে, পিঠে গজিয়ে ওঠে দুটো ফোটন-ডানা।
সে এবার এক লাফে ছায়া-পিশাচের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
ছায়া-পিশাচ ও লুমিয়রের মধ্যে শুরু হয় ভয়ংকর যুদ্ধ—ফোটনের গর্জন আর ডার্ক এনার্জির ছোঁয়ায় আশপাশের গাছ গলে যায়, বালি গরম হয়ে ওঠে।
শেষ মুহূর্তে, লুমিয়র তার মুখ থেকে ছোঁড়ে এক ফোটন-প্রোজেক্টাইল, যা ছায়ার শরীরে গিয়ে আঘাত করে—
বিস্ফোরণ!
ধোঁয়ার মধ্যে ছায়া টুকরো হয়ে বিলীন হয় বাতাসে যুদ্ধশেষে
কদির হাঁপাচ্ছে, চোখে জল।
সে আবিরের দিকে তাকায়—"এই... এটা কী? কেন এটা আমাকে খুঁজছে?"
আবির কিছু বলতে পারে না।
লুমিয়র ফিরে এসে কদিরের পাশে বসে পড়ে। তার চোখে আছে প্রশান্তি... এবং গোপন কিছু।
স্টোভাটর জানালার মতো এক ডার্ক পুলের দিকে তাকিয়ে আছে।
"প্রথমটা ব্যর্থ," সে ফিসফিস করে।
"কিন্তু ও এখন প্রতিরোধ করছে... মানে অ্যাথারিয়ামের অংশগুলো কাজ করছে... তার মানে, সময় এসেছে—দ্বিতীয় শিকারী পাঠানোর।"
তার পেছনে ছায়ার ভেতর একটা আরও ভয়ংকর আকার গড়ে উঠছে—দ্বিগুণ শক্তিশালী, দ্বিগুণ নিষ্ঠুর।
> আলো প্রথম জেগেছে, কিন্তু ছায়া এখন আরও গভীর হয়ে ফিরে আসছে। এবং কদিরের যুদ্ধ এখন কেবল শুরু।

অধ্যায় ৫

বাড়ি ফেরার পর কদির নিজেকে আর আগের মতো মনে হলো না। লুমিয়র এখন তার ছায়ার মতো সাথে থাকে, আর আবিরও যেন কিছুটা দূরে সরে গেছে—সে ভয় পায়, তবে সেটা অস্বীকার করে।
কদির রাতে চাচার ঘরের সেই গোপন কক্ষে আবার নামে। এবার সে জানে কোথায় তাকাতে হবে। বাক্সটা সরিয়ে দেয়ালে ঠেকানো এক কাঠের তাক খুলতেই বেরিয়ে আসে ধুলোমাখা একটা পুরনো খাতা।
চামড়ার মোড়ানো সেই খাতার উপরে আঁকা এক প্রতীক—তিনটি বৃত্ত, একে অপরকে ছুঁয়ে থাকা, মাঝখানে এক বিন্দু। ঠিক যেমনটা ছিল সেই চিঠির নিচে।
খাতা খুলতেই কদির দেখে, এর প্রতিটি পাতায় আঁকা কিছু কল্পনাপ্রাণীর ছবি—কেউ ডানাওয়ালা, কেউ আগুনের মতো গলে পড়ছে, কেউ অদৃশ্য ছায়ার মতো।
আর প্রতিটি প্রাণীর পাশে লেখা কিছু অদ্ভুত শব্দ, মনে হয় ভাষাটা বাংলার মতো কিন্তু কিছু অক্ষর বদলে দেওয়া।
একটায় লেখা: "লুমিয়র, শ্রেণি: ফোটন বিশুদ্ধ, উপপৃথিবীর রক্ষক, বাহক: কদির"
সে চমকে ওঠে। এই খাতা তার নাম বলছে?
পাতা উল্টাতেই আরেকটি ফাঁকা খোলা জায়গায় লেখা: “যদি অ্যাথারিয়াম সঠিক বাহক খুঁজে পায়, তবে প্রাণীগণ জাগবে।”
আর নিচে, ছোট করে হাতে লেখা—
“পাথরটা বেছে নেয়, মানুষ নয়।”
কদির অবাক হয়ে বসে থাকে। তখনই বাইরে হালকা শব্দ হয়।
সে দ্রুত উঠে জানালার পাশে যায়। দেখা যায়, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আবির। তার গলায় কাদা লেগে, মুখে ছোট আঁচড়।
“কদির...,” সে দম নিতে নিতে বলে, “আমি একটা কিছু দেখেছি... একটা ছায়া আমাকে অনুসরণ করছিল।”
কদির দরজা খুলে দেয়। আবির ঢুকেই বলে, “আমরা একা না। সেই ছায়াটা আমার মাথার ভেতর কথা বলেছে।”
কদির থমকে যায়, “কি বলেছে?”

আবির বলে, “ও বলেছে—‘তোমার বন্ধুর পাথরটা চায় আমাদের রাজা।’ আমি জানি না ও কে… কিন্তু ও জানে তুই পাথরের বাহক।”
কদির চুপ থাকে।
তার মাথার ভেতরে গুঞ্জন করে সেই শব্দ—“পাথরটা বেছে নেয়…”
আর সে জানে, আজ থেকে সবকিছু পাল্টে যাবে।

অধ্যায় ৬

আবির ঘরের কোণে বসে কাঁপছে। বাইরে বাতাস থেমে গেছে, কিন্তু ঘরের ভেতর যেন ছায়া জমাট বাঁধছে। লুমিয়র জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।
কদির চুপচাপ পুরনো খাতাটা আবার খুলে। এবার সে খুঁজে পায় আরেকটি পরিচিত প্রতীক—ছায়ার মতো আবছা এক অবয়ব, যার নামের পাশে লেখা: "নক্সাল"
তার নিচে ছোট হরফে: “ছায়ার দূত, দ্বিতীয় শিকারী, ডার্কফোর্স দ্বারা চালিত।”
কদির ধীরে চোখ তুলে আবিরের দিকে তাকায়।
“ওরা শুধু আমাকে না, তোকেও টার্গেট করেছে।”
আবির কিছু বলে না, কেবল মাথা নাড়ে।
ঠিক তখনই ঘরের বাতি এক ঝলকে নিভে যায়। দেয়ালে ছায়ারা নড়তে শুরু করে, যেন তারা বেঁচে আছে।
কদির দ্রুত পাথরটা বের করে আনে। এবার সেটা ঠাণ্ডা নয়—তা গরম, ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে।
একটা শব্দ হয়—ঘরের দরজায়।
টোক। টোক। টোক।
কদির এগিয়ে যায় না। লুমিয়র তার পাশে এসে দাঁড়ায়।
দরজা না খুলেও তারা জানে—ওপাশে কেউ আছে।
আবির হঠাৎ ফিসফিস করে—“ও বলে গেছে… ‘নক্সাল আসছে।’”
কিছুক্ষণ নীরবতার পর দরজার নিচ দিয়ে হালকা কালো ধোঁয়া ঢুকে পড়ে। সেটা মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসে, আর এক মুহূর্তেই সেটার ভেতর থেকে গড়ে ওঠে এক ছায়া-প্রাণী। মাথাহীন, হাত লম্বা, গায়ে কালো আঁকাবাঁকা দাগ।
এটা নক্সাল।
লুমিয়র গর্জন করে সামনে এগিয়ে যায়, কিন্তু নক্সাল এবার আগের ছায়ার মতো দুর্বল নয়।
সে হাত তুলতেই ঘরের কাচ ভেঙে ছিটকে পড়ে। ফোটনের শক্তি বাতাসে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু নক্সাল সেই শক্তি শুষে নেয় নিজের শরীরে।
“এইটা… শক্তি শুষে নিচ্ছে!” কদির হতভম্ব।
পাথরটা তখনই কদিরের হাতের তালু থেকে তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। তার চোখের সামনে খাতার পাতা খুলে নিজে থেকেই চলে যায় এক নির্দিষ্ট জায়গায়।
সেখানে লেখা—
“নক্সালকে থামাতে হলে, আলোতে নয়, তাকে তার ছায়া ফিরিয়ে দিতে হবে।”
“ছায়া ফিরিয়ে দিতে হবে…?”—কদির ভাবতে থাকে। হঠাৎ সে বুঝতে পারে—নক্সাল আলো শুষে নেয়, কারণ সে নিজে আলোর অভাব।
তার মুখ দিয়ে ফিসফিস করে একটি শব্দ বের হয়—“ছায়া, ফিরো…”
পাথরটা এবার নিজের মতো করে ঘূর্ণন শুরু করে। তার থেকে বের হয় এক গাঢ় নীল বলয়, যা ধীরে ধীরে নক্সালের চারপাশ ঘিরে ফেলে।
নক্সাল থেমে যায়।
তার শরীর ধীরে ধীরে টুকরো হতে থাকে—ধোঁয়ার মতো, ছায়ার মতো।কোনো বিস্ফোরণ নয়, কোনো গর্জন নয়—শুধু নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় সে, নিজের উৎসে।
ঘর আবার স্বাভাবিক।
আবির ধীরে বলে—“তুই কি তাকে… রিডিম করলি?”

কদির কিছু বলে না।
তার মনে কেবল একটি প্রশ্ন ঘোরে—“আমি কে?”
আর এই পাথর, এই প্রাণীগুলো, এই ছায়া...
এই সবের মধ্যে তার ভূমিকা কী?

অধ্যায় ৭

নক্সালের চলে যাওয়ার পর পুরো ঘর যেন নিঃশ্বাস ফেলল। বাতাস একটু হালকা হলো, আবির ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।
কদির তখনো পাথরটা হাতে নিয়ে বসে আছে—এখন তা আবার শান্ত, যেন কিছুই হয়নি।
"তুই কী করলি ওকে?"—আবির জিজ্ঞেস করে।
"আমি ঠিক জানি না..."—কদির ফিসফিস করে। "পাথরটা... যেন নিজে থেকেই কাজ করছিল। আর আমার মাথায়... কে যেন কথা বলছিল।"
আবির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আমার মনে হয় তুই এখন একা না। এই পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যেটা তোকে গাইড করছে।"
কদির কিছু বলার আগেই খাতাটা আবার নিজের মতো খুলে যায়। নতুন একটা পৃষ্ঠা—তাজা কালি, যেন এইমাত্র লেখা হয়েছে। সেখানে আঁকা হয়েছে এক রাশ জ্যোতির্ময় রূপরেখা—এক বিশাল ডানাওয়ালা সিংহ, তার নামের নিচে লেখা:
“এলিয়ন, আকাশের দৃষ্টি।”
আর পাশে লেখা:
“তোমার দ্বিতীয় অভিভাবক ঘুমিয়ে আছে উত্তর মরুভূমির উঁচু টিলায়। আলো তাকে জাগাবে, কিন্তু শুধুই যদি বাহকের মনে সন্দেহ না থাকে।”
আবির কদিরের দিকে তাকায়। “তোর আরেকটা প্রাণী আছে?”
কদির ধীরে মাথা নাড়ে। “অন্তত খাতা তাই বলছে।”
“উত্তর দিক মানে... তোদের পুরনো ক্যাম্পের ওদিকে, না?” আবির মনে করার চেষ্টা করে।
“হ্যাঁ। যেখানে আমরা ছোটবেলায় বালি দিয়ে দুর্গ বানাতাম।”
“তাহলে কাল সকালে রওনা দিতে হবে।”
কদির জানে, সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না।
রাতে ঘুম আসে না তার। জানালার পাশে বসে লুমিয়র দাঁড়িয়ে থাকে পাহারা দিয়ে। কদির খাতার পাতা উল্টায়—প্রতিটি প্রাণী যেন তাকে চেনে, তার ভেতরের ভয় আর সাহস দুটোই জানে।
আর একবার পাথরের উপর হাত রাখতেই সে আবার সেই অনুভূতি পায়—কেউ যেন তার চিন্তা পড়ছে।
কিন্তু এবার, সেই চেনা কণ্ঠে শুধু একটা কথা বলে—
“তোমাকে তৈরি হতে হবে।”
সকালে সূর্য ওঠার আগে, দুই কিশোর আর একটি জ্যোতির্ময় প্রাণী মরুভূমির পথে রওনা দেয়—তাদের সাথে এক রহস্যময় খাতা, আর এক পাথর, যেটা এখনো নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রেখেছে।

অধ্যায় ৮

মরুভূমির ভোর অন্যরকম। আলো ওঠে কিন্তু উত্তাপ নয়, বরং একধরনের নীরবতা নামিয়ে আনে। কদির আর আবির হাঁটছে ধীরপায়ে—পিছনে লুমিয়র, মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে।
তারা যাচ্ছে সেই পুরনো জায়গায়—উত্তরের ধুলিময় টিলা, যেখানে একসময় তাঁবু ফেলে ছোট ছোট দুর্গ বানাতো। এখন সেই জায়গা আর খেলার মাঠ না, এটা একটা লক্ষ্যের জায়গা।
টিলায় পৌঁছে কদির থামে। এখানে বালির নিচে একটা গর্তের মতো খাঁজ আছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক মাঝখানে। খাতায় লেখা ছিল, “আলোই তাকে জাগাবে।”
সে পাথরটা বের করে, সূর্যের দিকে তোলে।
প্রথমে কিছু হয় না।

তারপর... পাথরটা হালকা কম্পন করতে শুরু করে।
এক ঝলক নীল-সোনালি রশ্মি বের হয়ে গর্তে পড়তেই বালু কাঁপতে শুরু করে।
ধীরে ধীরে বালুর নিচ থেকে ওঠে এক বিশাল পাথুরে বর্মে মোড়া ডানাওয়ালা কিছু—তার চোখ দুটো বন্ধ, শরীর নিস্তব্ধ।
তার নাম কদির জানে—এলিয়ন।
এক মুহূর্তের নীরবতার পর প্রাণীটা চোখ খুলে।
তার চোখে গাঢ় সোনালি আলো, যেন আকাশের রোদ একত্র হয়েছে সেখানে। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—
“তুমি বাহক?”
কদির কিছুক্ষণ থেমে বলে, “হ্যাঁ। আমি... আমি জানি না ঠিক কে, কিন্তু এটা আমার কাছে আছে।” সে পাথরটা তুলে ধরে।
এলিয়ন মাথা নিচু করে সম্মান জানায়। “তাহলে আমিই তোমার আকাশরক্ষক।”
আবির হঠাৎ বলে ওঠে, “আরও আছে না? আরও অনেক এমন প্রাণী?”
এলিয়ন তাকায় তার দিকে। “তুমি বাহক নও, কিন্তু তোমার হৃদয়ে ভয় নেই। তোমাকে রক্ষা করা হবে।”
হঠাৎ দিগন্ত থেকে বাতাসের গর্জন শোনা যায়।
একটা ঘূর্ণি ধুলোবালির তৈরি হয়ে উঠছে—তার মাঝখানে যেন কেউ আসছে।
কদির, এলিয়ন, লুমিয়র আর আবির সবাই সামনে তাকিয়ে দাঁড়ায়।
ঘূর্ণির মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে এক শূন্য চোখের, ছায়া-পরিচালিত সৃষ্টি।
নক্সাল নয়, এটা আরও বড়, আরও দ্রুত।
এলিয়ন বলে, “ওটা তৃতীয় শিকারী। তোমার পরীক্ষা এখনই শুরু।”
কদির পাথরটা শক্ত করে ধরে।
সে জানে, এ লড়াই আর কল্পনার খেলা নয়। এবার সে নিজেকে প্রমাণ করবে, শুধু একজন বাহক নয়—একজন নেতা হিসেবে।

অধ্যায় ৯

বাতাস তীব্রভাবে গর্জে উঠল। চারপাশে ধুলোয় চোখ মেলে থাকা কঠিন। আবির চিৎকার করে উঠল, “কদির! এটা আমাদের প্রথম যুদ্ধ না!”
কিন্তু কদির এখন শান্ত।
লুমিয়র তার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে—নিচু হয়ে প্রস্তুত।
এলিয়নের বিশাল ডানা ধীরে ধীরে খুলছে, যেন আকাশকে দুই ভাগ করছে।
আর সেই ছায়া-সত্তা—তৃতীয় শিকারী—এক অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে আসছে। তার শরীর আবছা, চেহারা নেই, কেবল অন্ধকার আর তার ভেতর এক ঘূর্ণমান সুর—বিকৃত আর প্রাচীন।
“নাম কী ওর?”—কদির চিৎকার করে এলিয়নের দিকে তাকায়।
“ওর কোনো নাম নেই,” এলিয়নের গম্ভীর উত্তর। “ডার্কফোর্স তাকে নাম দেওয়ার আগেই তৈরি করেছিল।”
ছায়া-সত্তা এবার লাফিয়ে এসে কদিরের দিকে এক ছায়ার হাত ছুঁড়ে দেয়।
ঠিক তখনই এলিয়ন আকাশে উঠে গিয়ে ডানার ঝাপটায় সেই আক্রমণ সরিয়ে দেয়।
আবির লুমিয়রকে ইশারা করে, “পেছন দিক ঘিরে ফেল!”
লুমিয়র তীব্র গর্জনে জ্যোতির্ময় বল তৈরি করে—এবার সেটি ছায়ার শরীরে গিয়ে আঘাত হানলেও তা কিছুটা শুষে নেয়।
কিন্তু কদির খেয়াল করে, ছায়া-সত্তা শুষছে শুধু আলো—তাপ নয়।
সে তখন পাথরটা দুই হাতে ধরে, চোখ বন্ধ করে অনুভব করে সেই কম্পন।
এক ঝলক তাপের ঢেউ তার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখে আসে একটা নতুন নাম—
“ফ্লেম ক্যারল!”
পাথরটা এবার আগুনের মতো জ্বলে উঠে।
একটি নতুন রশ্মি ছুটে যায় লুমিয়রের গায়ে—তার শরীর থেকে বের হয়ে আসে আগুন-ঘেরা একটা বল।
লুমিয়র সেটি ছুঁড়ে দেয় তৃতীয় শিকারীর দিকে।

ধ্বংস নয়—ছায়া পুড়তে শুরু করে।
শুধু তখনই সে ছায়া-সত্তা গর্জে উঠে সরিয়ে যায় অনেকদূরে, অদৃশ্য হয়ে যায় বালুর ঝড়ের মাঝে।
নীরবতা।
কদির হাঁপাতে থাকে।
এলিয়ন নিচে নামে, মাথা নত করে বলে, "তুমি এখন আগুনের সুর জানো। আরও অনেক সুর আছে... এই পাথরের মধ্যে।"
আবির হেঁটে আসে পাশে। "তুই জানিস না ঠিক কী করছিস, কিন্তু আমি জানি... তুই একা না।"
কদির একবার আকাশের দিকে তাকায়।
তার মনে হয়, কেউ—কিছু—তাকে দেখছে।
আর সে এখন জানে... যুদ্ধ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

অধ্যায় ১০

রাত গভীর।
শিবিরে আগুন জ্বলছে। এলিয়ন পাহারায়, লুমিয়র শান্ত হয়ে পাথরের পাশে বসে আছে, যেন কোনো অভ্যন্তরীণ ভাষায় পাথরের সঙ্গে কথা বলছে।
কদির একা বসে খাতাটা খুলে রেখেছে সামনে। এক পৃষ্ঠা হঠাৎ নিজে থেকে উল্টে গেল।
সেই পাতায় নেই কোনো প্রাণীর ছবি—শুধু একটা চক্রাকারে আঁকা প্রতীক, যা পাথরের নিচেও খোদাই করা ছিল। আর নিচে লেখা—
"অ্যাথারিয়াম: সত্তা নয়, এক পরিপূর্ণ বাস্তবতা। বাহক নয়, তারই রূপ।"
কদির পড়া থামিয়ে দেয়। হঠাৎ যেন পাথরের ভেতর থেকে এক কন্ঠস্বর ভেসে আসে—নরম, স্পষ্ট, পরিচিত...
"তুমি এবার প্রস্তুত। এখন শোনো আমার কথা।"
পাথরটা ধীরে ধীরে বাতাসে ভেসে ওঠে। তার চারপাশে জ্যোতির্ময় বলয় তৈরি হয়।
আবির উঠে আসে পাশে। এলিয়ন ও লুমিয়র নীরব।
অ্যাথারিয়ামের কন্ঠ এবার স্পষ্ট:
"আমি শুধু একটি পাথর নই, কদির। আমি এক
মহাজাগতিক সত্তা। আমার ভেতর আছে শত শত কাল্পনিক জগত, যেখানে সময়ের গতি, জীবনের নিয়ম, শক্তির উৎস—সবকিছুই আলাদা।"
"আমি ছিলাম এক পরিপূর্ণ ডাইমেনশনের রক্ষক। সেই ডাইমেনশন যেখানে জাদুকরী প্রাণীগণ থাকত, যেখানে সত্য আর কল্পনা মিশে একাকার হতো। আমি ছিলাম তাদের রক্ষাকবচ—তাদের জীবনীশক্তি।"
"কিন্তু কেউ একজন—স্টোভাটর—আমার জগত ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সে আমার শক্তি নিতে চেয়েছিল... তাকে রুখতেই আমি নিজেকে পাথরের রূপে রূপান্তর করি।"
কদির কিছু বলতে পারে না। শুধু একবার ফিসফিস করে—"তাহলে... তুমি আমাকে বেছে নিয়েছ?"
"না, কদির," কন্ঠটি বলে, "তুমি নিজেই নিজেকে বেছে নিয়েছ। তোমার হৃদয়ে ভয় থাকলেও, সাহস তার চেয়েও বেশি। সেই সাহসই আমাকে জাগিয়েছে।"
এক ঝলক আলো ছুটে আসে পাথর থেকে, কদিরের বুকে প্রবেশ করে। মুহূর্তেই তার মনে এক প্রবল স্রোত আসে—চিত্র, শব্দ, অনুভূতি।
সে দেখে—অ্যাথারিয়ামের আসল রূপ। অসীম এক ডাইমেনশন, যেখানে ড্রাগন, লুমিয়র, এলিয়নের মতো অসংখ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে; আকাশ নীল নয়, রুপালি; পাহাড় অগ্নিময়; আর সময় এক অনির্ধারিত নদীর মতো।
সে দেখে স্টোভাটর—কালো কুয়াশায় মোড়া, চোখহীন, তবু সব দেখতে পায়। সে ধ্বংস চায় না শুধু, সে পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ চায়।
কদির হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—"থামো!"
পলকেই দৃশ্য ভেঙে যায়।
কদির ঘামে ভেজা, হাঁপাচ্ছে।

পাথরটা আবার শান্ত। তার বুক হালকা জ্বলছে, যেন ভেতরে একটা নতুন কিছু শুরু হয়েছে।
আবির আস্তে জিজ্ঞেস করে, “কি দেখলি?”
কদির তাকিয়ে বলে, “আমার পাথর না… আমি নিজেই অ্যাথারিয়ামের অংশ। আর ও… ও ফিরেছে।”
আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে—এই যুদ্ধ তার জন্য না শুধু, এই যুদ্ধ অ্যাথারিয়ামের জন্য, এক জগতের অস্তিত্বের জন্য।

অধ্যায় ১১

মরুভূমির রাত্রি ঠান্ডা আর নিঃশব্দ, কিন্তু কদিরের ভেতরে ঝড় বইছে। অ্যাথারিয়াম তার পরিচয় দিয়েছে—সে কেবল এক পাথর নয়, এক মহাজাগতিক সত্তা। আর কদির এখন শুধু বাহক নয়, তারই অংশ।
কিন্তু এই সত্য জানার ঠিক পরপরই কিছু একটা বদলে গেছে।
পাথরের আলো নিভে যাওয়ার আগ মুহূর্তে এক ঝলক চিত্র সে দেখেছিল—এক চোখবিশিষ্ট ছায়া-সত্তা, যার চারপাশে সময় বাঁক খাচ্ছে। তার অস্তিত্ব বাস্তবতার বাইরে, যেন সে কোনো গাণিতিক ভুল, এক বিকৃত সত্য। সেই ছায়া বলছিল—
“তুমি তো আমার ভাইয়ের বাহক… এবার দেখা হবে আমার সঙ্গে।”
কদির এখন জানে, পরের শত্রু আসছে। এবং এইবার… এটা নক্সাল বা কোনো দুর্বল ছায়া নয়।
সকালবেলা এলিয়ন হঠাৎ বলে, “কোনো কিছু আমাদের দিকে আসছে… অনেক দূর থেকে, কিন্তু সময় গলছে।”
আবির আশপাশে তাকায়, “মানে সময় গলছে?”
লুমিয়র ফিসফিস করে, “মানে সময় এখানে কাজ করছে না ঠিকভাবে। কোনো কিছু আসছে, যেটা সময়কে মানে না।”
সেই মুহূর্তেই বালির নিচ থেকে এক বিকট গর্জন ওঠে।
পুরো টিলা কেঁপে যায়।
ধুলোর ভেতর থেকে উঠে আসে এক বিকট আকারের ছায়ামূর্তি—চার হাতে সময়ের ঘড়ির মতো ঘূর্ণায়মান দাগ, চোখে কোনো তারা নেই, কিন্তু চেহারায় বিকৃত এক হাসি।
“আমার নাম ক্রোনাশ, ডার্ক টাইমের দূত। স্টোভাটরের প্রথম সত্য বাহিনী আমি।”
কদির, এলিয়ন, লুমিয়র আর আবির পিছিয়ে আসে। এলিয়ন বলেই ফেলে, “এটা নক্সালের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এটা সময় নিজেই মোচড় দিতে পারে।”
ক্রোনাশ তার চারদিকে এক বৃত্ত তৈরি করে—সেখানে দাঁড়ালেই সময় বন্ধ হয়ে যায়। বালির কণাও বাতাসে থেমে থাকে, এবং লুমিয়রের একপাশ সেই বৃত্ত ছুঁতেই সে জমে যায়।
“লুমিয়র!”—কদির চিৎকার করে।
কিন্তু লুমিয়রের শরীর পাথরের মতো হয়ে গেছে—না চলতে পারছে, না কিছু বলতে।
ক্রোনাশ হেঁটে আসে—তার প্রতিটি পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের ঘড়ি যেন পেছনে যায়। আবির চোখের সামনে দেখে—তার ছায়া সরে যাচ্ছে উল্টো দিকে।
এলিয়ন তখন আকাশে উঠে গর্জন করে—ডানার স্পন্দনে এক মহাতাপ ছড়িয়ে দেয় বাতাসে, কিন্তু সেটাও বৃত্তে ঢুকতেই স্থির হয়ে যায়।
ক্রোনাশ হাসে, “আগুন, আলো, কোনো কিছুর গতি এখানে কাজ করে না।”
কদির এবার অ্যাথারিয়ামের পাথর তুলে নেয়—তার মধ্যে আলো আবার জ্বলে ওঠে।
কিন্তু এবার আর পাথর নিজে কিছু করছে না।
একটা কন্ঠস্বর বলে—“তুমি এখন নিজে বেছে নাও, কোন সুর বাজাবে।”
কদির খাতার পাতা উল্টায়। একটা পাতায় লেখা:
“Chrono Rift — সময়-বিকৃতির বিপরীত। ব্যবহার করতে হলে বাহকের হৃদয়ে অতীত না থাকতে হয়।”
সে বুঝে—ক্রোনাশ যেহেতু সময়কে থামাতে পারে, তাহলে তাকে হারাতে হবে সময়কে ভেঙে দিয়ে, কিন্তু নিজের ভেতরের অতীত ভুলে।
কিন্তু তার হৃদয়ে তো আছে চাচা সাইদের মৃত্যু, নুরআলমপুরের সব স্মৃতি, আবিরের ভয়…
সে পারবে?
ক্রোনাশ বলে, “তুই প্রস্তুত নস—তোর অতীত তোকে বেঁধে রেখেছে।”

কদির চোখ বন্ধ করে, গভীরভাবে শ্বাস নেয়।
সে নিজের স্মৃতিগুলো একে একে দেখে: চাচা সাইদের হাসি, ছোটবেলার ভুল, নিজের ভয়…
তারপর সে বলে—“আমি এগুলো ভুলছি না, বরং… গ্রহণ করছি। কারণ এগুলোই আমাকে তৈরি করেছে।”
সে চোখ খুলে বলে—“আমি সময় ভাঙবো, কারণ আমি জানি—আমি কে।”
পাথর থেকে বেরিয়ে আসে এক বিস্ময়কর নীল-রুপালি সুর, যেন সময় নিজেই থমকে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত।
তারপর সেই সুর গিয়ে আঘাত করে ক্রোনাশের বৃত্তে
এক বিকট বিস্ফোরণ হয়।
এলিয়ন কাদিরকে আচ্ছাদন করে রাখে, আবির পেছনে পড়ে যায়।
সব ধুলোর পরে দেখা যায়—ক্রোনাশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে তার শরীর ফেটে গেছে; তার একটা চোখ অন্ধ।
সে গর্জে উঠে, “এই যুদ্ধ শেষ না! সময় আমার অস্ত্র… আমি ফিরে আসবো।”
তারপর নিজেকে ছায়ার গর্তে গুটিয়ে নেয়, মিলিয়ে যায়।
লুমিয়র ধীরে ধীরে ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়।
কদির হাঁপাতে থাকে। তার বুকে পাথরটা আবার শান্ত।
কিন্তু এবার সে জানে—এটা শুরু মাত্র।
এবার থেকে প্রতিটি শত্রু শুধু শক্তিশালী হবে না—তাদের সঙ্গে থাকবে অস্তিত্বের গভীর এক প্রশ্ন:
কতটা সত্যি তুমি নিজের ভেতরে?
আর কদির জানে… সেই উত্তর খুঁজতে হলে, তাকে শুধু লড়তে হবে না, নিজেকেও ভাঙতে হবে।

অধ্যায় ১২

রাত গভীর, সবাই নিস্তব্ধ। আগের যুদ্ধের ক্লান্তি কদিরের শরীরে জমে আছে, কিন্তু ঘুম আসছে না। আগুনের আলোয় সে বসে আছে পাথরটা সামনে রেখে।
আবির ঘুমিয়ে পড়েছে, লুমিয়র ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। এলিয়ন পাহারায়।
পাথরের ভেতর হালকা কম্পন শুরু হয়। কদির সাবধানে হাতে তুলে নেয়।
তখনই খাতার এক পৃষ্ঠা নিজে থেকেই খুলে যায়।
একটি নতুন প্রতীকের নিচে লেখা—
“ডেসিমার: বিভ্রমের রাজা। সত্যের ছায়ায় জন্ম, মিথ্যার রূপ ধরে আক্রমণ করে। সে যা দেখায়, তা কখনও বাস্তব নয়।”
কদির ফিসফিস করে, “আরেকজন আসছে…”
সকাল বেলা মরুভূমি কুয়াশায় ঢাকা। সূর্য উঠেও আলো ছড়ায় না।
হঠাৎ কদির আবিরকে বলে, “আমরা ঘুরে ফিরে এক জায়গায় আসছি না?”
আবির থমকে যায়, “হ্যাঁ… প্রতিবার সামনে যাই, ঠিক সেই টিলাটা ফিরে আসে!”
এলিয়ন ওপর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, “এটা ডেসিমারের এলাকা। আমরা এখন বিভ্রমে বন্দী।”
চারদিক ধোঁয়াশায় ভরে যায়। লুমিয়রের আলো পর্যন্ত এ জায়গায় দুর্বল।
“আমাদের সত্য খুঁজে বের করতে হবে,” কদির বলে।
সে পাথরটা তুলে চোখ বন্ধ করে।
একটাই প্রশ্ন ভেসে আসে মনে—
"তুমি যা দেখছ, তা যদি মিথ্যে হয়… তুমি তখন কিসে বিশ্বাস করবে?"
কদির চোখ খুলে সরাসরি আবিরের দিকে তাকায়।
“তুই আসল না তো?”
আবির হেসে বলে, “তুই কি পাগল?
তখনই কদির এলিয়নের দিকে তাকায়—এক পলকেই সে বুঝে যায়…
এলিয়নের চোখে কোনো প্রতিফলন নেই।
“তুই এলিয়ন না,” কদির বলে।
“তুই ডেসিমার!”

ছায়া ফেটে পড়ে, বিভ্রম গলে গিয়ে এক বিকৃত হাসি ভেসে ওঠে ধোঁয়ার ভেতর থেকে।
ডেসিমার!
এই যুদ্ধ হবে চোখে নয়—মনে, বিশ্বাসে।
আর কদির জানে, এখন যুদ্ধটা শুরু হচ্ছে—বাস্তবতা বনাম বিশ্বাস।

অধ্যায় ১৩

কদির বিভ্রম থেকে বের হয়ে আসার পর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে। আবির পাশে এসে দাঁড়ায়, ভীত কিন্তু স্থির।
“ডেসিমার কোথায় গেল?” — আবির ফিসফিস করে।
“এখনো আছে,” কদির বলে, “সে আমাদের মনেই লুকিয়ে।”
হঠাৎ খাতার পৃষ্ঠা নিজে থেকেই খুলে যায়।
তাতে আঁকা এক বিকৃত মুখ—চোখ নেই, মুখ চওড়া, নিচে লেখা:
“ডেসিমার দ্বিতীয় রূপে ফিরবে। যে ভয় তুমি স্বীকার করো না, সে হয়ে উঠবে তোমার মুখ।”
আবির মুখ কালো করে ফেলে। “মানে…?”
কদির খাতার দিকে তাকিয়ে বলে,
“খাতা আবার সাবধান করে দিল। তাই মনে হচ্ছে, লড়াইটা এখনই শেষ হয়নি।”
লুমিয়র তখন বলে ওঠে,
“তোমার চাচা যখন খাতাটা খুঁজে পান, তিনি এটাকে এক ‘আগাম বার্তার বই’ বলতেন। এটাও তারই শক্তি।”
কদির একটু চুপ করে থেকে বলে,
“তাহলে, তিনি জানতেন—আমি একদিন এই পথেই আসবো।”
আকাশে এক অদ্ভুত কুয়াশা ঘনীভূত হতে থাকে।
এবার ভয়টা কেবল বাইরের নয়—নিজের ভিতরের।
ডেসিমার আবার ফিরছে।
তবে এবার, কদিরের মুখে।

অধ্যায় ১৪

কদির স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। সামনে ধোঁয়াশায় গঠিত এক নতুন ছায়ামূর্তি—চেহারা পুরোপুরি কদিরের মতো, কেবল চোখ দুটো ফাঁকা, মুখে বিকৃত এক হাসি।
“আমি তুই,” সে বলে, কন্ঠ কদিরেরই, তবে কাঁপনময় ও ঠান্ডা।
“তুই যা লুকাতে চাস, আমি তা-ই। তুই নিজের ভয়।”
কদির পেছনে সরতে চায়, কিন্তু পাথরটা ভারী হয়ে গেছে, যেন ওজন বাড়িয়ে দিয়েছে ভয়।
এলিয়ন বলে, “এটাই ডেসিমারের শেষ রূপ—মনের প্রতিচ্ছবি। একে আঘাত দিয়ে হারানো যায় না, একে মেনে নিতে হয়।”
ছায়া-কদির এগিয়ে আসে।
“তুই জানিস না, তুই এই পথের উপযুক্ত কি না। তুই জানিস না, তোর চাচা কেন তোর কাছে পাথরটা রেখেছিল।”
“চুপ!”—কদির চিৎকার করে।
ছায়া-কদির এবার আরও কাছে এসে ফিসফিস করে,
“তুই জানিস না… তোর ভিতরে স্টোভাটরের ছায়া আছে কিনা।”
সে হাত তোলে—পাথরের মতো শক্ত হয়ে আসে আকাশ।
আবির দৌড়ে আসে কদিরের পাশে, “তুই একা না, বুঝলি?”
কদির এবার পাথরের দিকে তাকায়। পাথর আলো ছড়ায় না। কেবল নীরব।
তখনই খাতা আবার খুলে যায়।
লেখা—
“নিজের ছায়াকে স্বীকার করলেই আলো ফিরে আসে।”

কদির চোখ বন্ধ করে।
সে স্বীকার করে—
হ্যাঁ, সে ভয় পায়।
হ্যাঁ, সে নিজের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহে থাকে।
হ্যাঁ, সে জানে না সে উপযুক্ত কি না।
সে চোখ খোলে।
পাথর আবার জ্বলে ওঠে।
এক ঝলক আলোতে ছায়া-কদির হালকা হয়ে যায়, এবং ধীরে ধীরে গলে গিয়ে মিলিয়ে যায়।
ডেসিমার পরাজিত।
কিন্তু এলিয়ন বলে,
"এটা তো শুধু শুরু। এর পরেরটি… আর বিভ্রম নয়। সে নিজেই এক ধ্বংসাত্মক সত্য।"
কদির আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝে নেয়—ডেসিমার শুধু তার নিজের ভিতরের প্রথম পরীক্ষা ছিল।
পরবর্তীটি আসবে বাহির থেকে। কিন্তু ছুঁয়ে যাবে মনের গভীরতা।
এবং যুদ্ধটা এবার হবে শুধু ছায়ার সঙ্গে নয়, সময়, অস্তিত্ব, সত্য আর ধ্বংসের শক্তির সঙ্গে।

অধ্যায় ১৫

তিনদিন ধরে মরুভূমি নীরব। আকাশে মেঘ জমেছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ে না। পাথর শান্ত, খাতা খুলছে না, সব কিছু যেন নিঃশব্দ ঝড়ের আগে থমকে আছে।
এলিয়ন নিচু গলায় বলে,
"ডেসিমারের পতনের পর স্টোভাটর নিশ্চয়ই জানে তুমি প্রস্তুত হচ্ছো। তাই এবার আসবে এমন কেউ, যার অস্তিত্ব নিজেই এক শাস্তি।"
লুমিয়র হালকা গর্জে ওঠে, তার চোখে অস্থিরতা।
তখনই, দূরের বালুর পাহাড় ফেটে এক কন্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে—
"আমি এলে সময় থেমে যায় না, বরং তার মানে বদলে যায়।"
এক লম্বা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে ধুলোর মাঝে হেঁটে আসে। তার মাথায় মুখোশ, কাঁধে ভাঙা ঘড়ির কাঁটা, তার এক হাতে বিশাল ত্রিভুজ আকৃতির অস্ত্র।
এলিয়ন ফিসফিস করে,
"ও এসেছে... নাম—মেল্টিক্স। সময় বিকৃতির জীবন্ত রূপ।"
কদির বলে, "সে কি ক্রোনাশের মতো?"
"না," এলিয়ন চোখ বন্ধ করে কাঁপা গলায় বলে,
"ক্রোনাশ সময়কে থামাতো। কিন্তু মেল্টিক্স সময়কে গলিয়ে ফেলে।"
তখনই চারপাশের বালি গলে জল হয়ে যায়, বাতাসের আওয়াজ বিকৃত, আবিরের দৃষ্টিশক্তি ঘোলা।
খাতা খুলে পড়ে যায়, পৃষ্ঠায় লেখা:
"যেখানে স্মৃতি পচে যায়, ভবিষ্যৎ সেখানে মরুভূমির মতো নিষ্প্রাণ।"
মেল্টিক্স এগিয়ে আসে—তার প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বাস্তবতা গলে যেতে থাকে।
কদির পাথর তোলে। পাথর জ্বলে না।
এলিয়ন বলে,
"তাকে শক্তি দিয়ে হারানো যাবে না। তাকে আটকে রাখতে হবে… সময়ের বাইরে।"
"কিন্তু কিভাবে?"—আবির চিৎকার করে।
লুমিয়র বলে,
"কোনো কিছুই চিরকাল গলতে পারে না… যদি তুমি সেটাকে সংরক্ষণ করো মনের এক সত্য অনুভবের ভেতর।"
এইবার যুদ্ধ কেবল অস্ত্র দিয়ে নয়। সময় ও স্মৃতির বিরুদ্ধে নিজেকে সংরক্ষণ করে টিকে থাকার যুদ্ধ।
মেল্টিক্স দাঁড়িয়ে, অস্ত্র তোলে। তার চোখজোড়া জ্বলছে কদিরের দিকে—

"তুই যদি নিজের ভবিষ্যৎ না জানিস, আমি তা গলিয়ে মুছে দেবো।"
এটাই শুরু হলো কদির ও মেল্টিক্সের প্রথম ধাক্কা।
এবার সময় নিজেই শত্রু।

অধ্যায় ১৬

মেল্টিক্স তার ত্রিভুজ অস্ত্র তুলে আকাশে আঘাত করল।
এক তীব্র বিকৃত শব্দ ছড়িয়ে পড়ল মরুভূমি জুড়ে। চারদিক কেঁপে উঠল, এবং সময় যেন টুকরো টুকরো হতে লাগল।
আকাশে সূর্য হঠাৎ ছায়া হয়ে গেল।
"দৌড়াও!"—এলিয়ন চিৎকার করে।
কদির, আবির, লুমিয়র ছুটে চলে, বালুর উপর পায়ের নিচে গলে যাচ্ছে বালি। তাদের পেছনে মেল্টিক্স ধীরে হেঁটে আসে, কিন্তু তার প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিয়ম বিকৃত হচ্ছে।
কদির পাথর বের করে আলো জ্বালাতে চায়—কিন্তু আলো ফ্ল্যাশ হয়ে হঠাৎ নিভে যায়।
"এটা কাজ করছে না!" কদির হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।
লুমিয়র বলে, "আমরা এখন তার সময়-জালে বন্দী। এখান থেকে পালাতে হলে আমাদের... সময়ের বাইরে যেতে হবে।"
"মানে?"—আবির দম বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করে।
এলিয়ন চোখ গম্ভীর করে বলে,
"তুমি কিছু সময়ের গুহা জানো না কদির? মরুভূমিতে কিছু গোপন স্থানে সময়ের প্রবাহ সোজা চলে না। ওখানে মেল্টিক্স ঢুকতে পারবে না সহজে।"
"তুমি কোথায় জানো সেই জায়গা?"—কদির জিজ্ঞাসা করে।
"একটিই জায়গা। নিম হারিণ্যের গুহা। পুরনো এক জাদুকরী প্রাণী ছিল, সে জায়গাটিকে সময়ের বাইরে রেখেছিল।"
তারা দৌড়াতে থাকে।
পেছন থেকে বালুর স্তম্ভ উঠে কাদিরদের আঘাত করতে চায়, কিন্তু এলিয়ন তার ডানার ঝাপটায় সেগুলো ঠেকায়।
লুমিয়র চারপাশে আলো ছড়িয়ে দিকভ্রান্তি কাটাতে থাকে।
একসময় তারা পৌঁছায় পাহাড়ি এক ফাটলের মুখে।
ভিতরে প্রবেশ করে... চারদিক হঠাৎ স্তব্ধ।
এক মুহূর্তেই সব শব্দ বন্ধ।
ঘড়ির কাঁটা চলে না। বালির নড়াচড়া নেই। বাতাস নিঃস্তব্ধ।
এটা সেই জায়গা… নিম হারিণ্যের গুহা।
কদির বলে, "আমরা সময়ের বাইরে?"
এলিয়ন ধীরে মাথা নাড়ে। "এখানে মেল্টিক্স ঢুকতে পারবে না কিছু সময়। কিন্তু বেশি নয়। ওর গলানো শক্তি ধীরে ধীরে এই সীমাও গলিয়ে ফেলবে।"
আবির বলে, "তাহলে আমরা এখন কি করবো?"
কদির খাতার দিকে তাকায়। এবার খাতা নীরব।
এইবার... উত্তর তাদের নিজের থেকেই খুঁজে বের করতে হবে।

অধ্যায় ১৭

গুহার ভিতর ঠান্ডা, অস্বাভাবিকভাবে শান্ত। সময় যেন জমে আছে।
আবির নিঃশব্দে দেয়ালে হাত রাখে—পাথরের গায়ে আঁকা রহস্যময় প্রতীক, যার মানে বোঝা যায় না, কিন্তু কিছু অনুভব করা যায়।
"এটা কার লেখা?"—সে ফিসফিস করে।
এলিয়ন বলে, "নিম হারিণ্য নামের এক সত্তা এখানে বাস করত বহু আগে। সে ছিল সময় থেকে বিচ্ছিন্ন, যাকে কোনো কিছুর অতীত বা ভবিষ্যৎ বলা যায় না। এই গুহা তার তৈরি।"

লুমিয়র সামনে এসে বলে,
“এখানে শুধু সময় বন্ধ নয়… এখানে স্মৃতিও স্থির।”
কদির খাতার পাতা উল্টায়।
এক নতুন লাইন লেখা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে:
“এখানে যা হারায়, তা ফিরে আসে অন্য রূপে।”
আবির হঠাৎ পেছনে তাকায়।
“আমার মা?”—তার কণ্ঠে শক।
এক নারী দাঁড়িয়ে, হাসিমুখে, আবিরের দিকেই তাকিয়ে।
কিন্তু এলিয়ন কাঁপা কণ্ঠে বলে,
“ও বাস্তব না… ও তোমার স্মৃতির ছায়া। এই গুহা তোমার ভেতরের সময়কে বাইরে এনে ফেলে।”
আবির এগিয়ে যেতে চায়, কদির ধরে ফেলে তার হাত।
“না! যদি এখন স্মৃতিতে আটকে যাস, আর বের হতে পারবি না।”
আবির চোখ বন্ধ করে, একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
“তাহলে ভুলতে হবে?”
“না,”—কদির ধীরে বলে—“ভালোবাসতে হবে, কিন্তু থেমে থাকা যাবে না।”
গুহার একপাশে তখন নতুন পথ খুলে যায়।
এলিয়ন বলে,
“এই গুহা পরীক্ষার জায়গা। যে নিজেকে বুঝে ফেলতে পারে, সে-ই এখান থেকে বের হতে পারে।”
তারা একে একে হাঁটতে থাকে সেই নতুন পথ ধরে।
পেছনে আবিরের মায়ের ছায়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।
তবে গুহা শেষ হয়নি।
এটা কেবল প্রথম ধাপ।

অধ্যায় ১৮

গুহার নতুন পথ অদ্ভুতভাবে রঙিন—দেয়ালে বিচিত্র আলো ঝিলমিল করে, যেন অজানা কোনো মহাজাগতিক ছবি আঁকা হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।
“এখানে সব কিছু এত উজ্জ্বল কেন?”—আবির চমকে ওঠে।
কদির মুখ গম্ভীর করে বলে,
“আমার খাতাটা... নিজে থেকেই কাঁপছে।”
তখনই, গুহার এক গভীর কক্ষে তারা পৌঁছায়। ঘরের মাঝে ঝুলে আছে একটি বর্ণিল, হালকা নীল-হলুদ-সবুজ আভাযুক্ত শক্তির কুন্ড।
এলিয়ন ফিসফিস করে,
“এটা কোনো প্রাণী না… এটা একটি ফোর্স।”
লুমিয়র ধীরে বলে,
“এর নাম... Aeralite Force। মহাজাগতিক স্ফটিক-শক্তি। একে গ্রহণ করলে, শরীরের নির্দিষ্ট অংশ অথবা পুরো শরীর এক ধরনের হীরার মতো রঙিন শীলা দিয়ে ঢেকে যায়। অস্ত্র, ঢাল, গতি... সব কিছু এক হয়ে যায়।”
আবির ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।
“আমি... এটা অনুভব করতে পারছি,”—তার কণ্ঠে বিস্ময়।
“তুই কি নিশ্চিত?”—কদির বলে।
“না,”—আবির বলে, “কিন্তু আমি জানি, আমার ভেতরে এখন কিছু বদলাচ্ছে।”
সে হাত বাড়ায়।
Aeralite Force হালকা গুঞ্জন তোলে… তারপর তার দিকে ধেয়ে আসে এক ঝলক আলো হয়ে।

আবিরের শরীর চকচক করে ওঠে। তার ডান হাত প্রথমে শক্ত হয়ে যায়, রঙিন হীরার মতো আবরণে ঢেকে যায়। এরপর তার ডান পা, বুক, কাঁধ—সব কিছু আংশিক রূপান্তরিত হয়।
তার চোখ জ্বলে ওঠে রক্তিম-নীল আলোর মাঝে।
সে এক লাফে গুহার এক প্রান্তে পৌঁছে যায়—সময় যেন থেমে যায় এক মুহূর্তে।
“সে এখন সময়ের বাইরে চলতে পারবে,”—এলিয়ন বলে।
কদির চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে, তার সেরা বন্ধু এখন আর শুধু ‘সাহসী’ নয়—
সে এখন একটি চলন্ত মহাজাগতিক ফোর্সের ধারক।
আবির নিজের হীরার হাতটি দেখে ফিসফিস করে,
“এটা শুধু শক্তি না… এটা একটা দায়িত্ব।”
এবং কদির বুঝতে পারে, পরবর্তী যুদ্ধে…
এই Aeralite Force হবে তাদের একমাত্র আশা।

অধ্যায় ১৯

গুহার শেষ প্রান্তে পৌঁছেই বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।
আবিরের শরীরে এখনও ঝলসে থাকা রঙিন হীরার আবরণ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসে, যেন শক্তি সাময়িকভাবে থিতু হয়েছে।
কদির জিজ্ঞাসা করে, “তুই ঠিক আছিস?”
আবির মাথা নাড়ে। “শরীর ভারি… কিন্তু মাথাটা যেন আগের চেয়ে পরিষ্কার।”
হঠাৎ এক টান অনুভব করে সবাই। সময় আর স্থান যেন একসাথে ঘুরে যায় চারপাশে।
গুহার পাথরের দেয়াল গলে গিয়ে সামনে তৈরি হয় এক ঘূর্ণায়মান দরজা—তার মাঝে দেখা যায় এক পরিত্যক্ত নগরী, সময়হীন এক শূন্য জায়গা।
এলিয়ন ফিসফিস করে বলে,
“এটা হলো Azterian Corridor… মেল্টিক্সের তৈরি বিকৃত পথ। এটা আসলে একটা ফাঁদ।”
“তাহলে এখানে ঢোকা ঠিক হবে?” কদির প্রশ্ন করে।
“আমরা যদি এই পথ না নিই, তাহলে মেল্টিক্স আমাদের পৌঁছানোর আগেই সময়কে গলিয়ে ফেলবে।” লুমিয়র বলে।
তারা দরজার ভেতর পা রাখে।
মুহূর্তেই চারপাশ বদলে যায়—তারা এখন এক মৃত শহরে, যেখানে বাড়িগুলো আকাশের দিকে হেলে আছে, রাস্তা উল্টো, আর সময়ের গতিবিধি নেই।
হঠাৎই সামনে এসে দাঁড়ায় এক ছায়ামূর্তি।
তার মুখ নেই, হাত নেই—শুধু একধরনের ফাঁপা ঘড়ির টিকটিক শব্দ।
এলিয়ন চাপা স্বরে বলে,
“এটা Zeroth—মেল্টিক্সের প্রথম ছায়া-প্রহরী। সময়ের রূপক।”
কোনো কথাবার্তা নেই।
Zeroth হঠাৎ সামনে এক আঘাত ছোড়ে।
আবির বিদ্যুতের গতিতে সামনে এসে দাঁড়ায়—তার হীরার ঢাল সামনে উঠে আসে, আঘাত সজোরে লাগে ঢালে।
ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে পুরো নগর জুড়ে।
কদির বলে, “তোর গতি… এখনো আছে?”
আবির হাসে, “এবার শুধু দৌড় নয়… প্রতিঘাতও হবে।”
এবং যুদ্ধ শুরু হয়।
Zeroth-এর বিকৃত সময়-প্রবাহ বনাম Aeralite Force-এর উল্টো-গতির আক্রমণ।
এটা কেবল মেল্টিক্সের পথের শুরু…
আরো ছায়া আসবে,
আরো ধ্বংস আসবে।

কিন্তু কদির জানে, এবার সে একা নয়।
তার পাশে আছে একজন যোদ্ধা, যার সময়কে ছুঁয়ে ফেলার ক্ষমতা আছে।

অধ্যায় ২০

Zeroth গলে যায় ধোঁয়ার মতো। চারপাশে সময়ের বিকৃতি স্থির হয়, কিন্তু বাতাসে ভারী চাপ রয়ে যায়।
এলিয়ন বলে, "এই শহরের প্রতিটি স্তরে মেল্টিক্স তার ছায়া রেখে গেছে। তার শেষ রূপ এখানেই অপেক্ষা করছে।"
আবির কাঁধ ঘষে হীরার আবরণ দেখে, "আমার শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে… যেন এই শক্তি ভেতর থেকে চাপ বাড়াচ্ছে।"
"এই ফোর্স চায় তুমি সময় ভেদ করো,"—লুমিয়র গম্ভীর গলায় বলে।
তারা এগিয়ে চলে শহরের মধ্যভাগে—এক বিশাল পাথরের প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঠিক তখনই…
এক অদ্ভুত শব্দ।
কেউ হাঁটছে ধীর গতিতে—কিন্তু চারদিকে জগত গলতে শুরু করেছে।
প্রাচীর ফেটে বেরিয়ে আসে সে।
মেল্টিক্স।
চোখে আগুন নেই। মুখে রাগ নেই।
শুধু শূন্যতা।
হাতে বিশাল ত্রিভুজ অস্ত্র।
"তোমরা সময়ের বাইরে পালিয়ে এসেছো,"—সে বলে, "কিন্তু এবার আমি তোমাদের সময়ই মুছে দেবো।"
কদির পাথর তুলে। লুমিয়র তার ডানা মেলে।
আবির ধীরে ধীরে সামনে আসে। তার শরীর আবার হীরার আলোয় জ্বলে ওঠে।
মেল্টিক্স অস্ত্র তোলে—চারপাশে বাস্তবতা গলে যেতে থাকে।
আবির বলে,
"এবার আমি তোকে তোর সময়েই হারাবো।"
সে Aeralite Force-এর ভিতরকার স্পিড কোর সক্রিয় করে। এক আলোকরেখা তার শরীর বেয়ে উঠে।
তার চলাফেরা অসম্ভব রকম দ্রুত হয়ে যায়।
এক সেকেন্ডে সে একবার না, পঞ্চাশবার আক্রমণ করে মেল্টিক্সকে।
কিন্তু…
মেল্টিক্স হঠাৎই থেমে যায়।
তার কন্ঠ ঠান্ডা,
"তুমি এখন এত দ্রুত যে… তুমি নিজেই আর সময়ের ভিতর নেই।"
আবিরের চারপাশ হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়। সব কিছুর গতি থেমে যায়।
কদির, এলিয়ন, শহর—সব স্থির।
শুধু সে চলছে।
"আমি কোথায়?"—আবির চিৎকার করে।
কিন্তু তার কন্ঠও প্রতিধ্বনি হয় না।
সে এখন সম্পূর্ণভাবে সময়ের বাইরে।
Aeralite Force তাকে দিয়েছে এমন গতি…
যা তাকে জগতের ছন্দ থেকে আলাদা করে ফেলেছে।
এবং এখন—
সে ফিরে আসবে কিনা…
তা সে নিজেই জানে না।
মেল্টিক্স ধীরে কদিরের দিকে তাকায়।
"তোমার সৈন্য এখন নেই।"
কদির একা দাঁড়িয়ে, পাথর হাতে।

কিন্তু তার চোখে ভয় নেই।
শুধু একটা বিশ্বাস—
আবির সময়ের বাইরে গেলেও… ফিরবেই।
আর সেই ফিরে আসার দিনটাই হবে
মেল্টিক্সের পতনের শুরু।

অধ্যায় ২১

সবকিছু থেমে গেছে।
মেল্টিক্স ধীরে ধীরে সামনে আসে, তার চারপাশ গলে যাচ্ছে। বাস্তবতা যেন তরল হয়ে মাটিতে পড়ে পড়ছে।
কদির স্থির দাঁড়িয়ে।
তার এক হাতে সেই রহস্যময় পাথর, আরেক হাতে খাতা।
"তুই একা,"—মেল্টিক্স বলে,
"তোর ফোর্স-ধারক এখন সময়ের বাইরে। আর তুই, একটা সাধারণ বালক।"
কদির চোখ বন্ধ করে।
ভেতরে অনুভব করে… পাথরটা আবার গরম। তার বুকের কাছে যেন জ্বলছে কিছু।
এমন সময় খাতাটা খুলে যায়।
লেখা ফুটে ওঠে—
"যার মন ভাঙে না, তার সামনে সময়ও নত হয়।"
কদির পাথর তোলে, সেটি এবার ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে গাঢ় নীলাভ আলোয়।
কোনো বিস্ট না… কোনো ফোর্স না…
তবে যেন ভেতর থেকে জন্ম নিচ্ছে এক সাহসী স্পন্দন।
কিন্তু মেল্টিক্স থেমে থাকে না।
সে সামনে এগিয়ে আসে, অস্ত্র তোলে—এক ঝলক বিকৃত সময় আঘাত করে দেয় কদিরের দিকে।
কদির লাফিয়ে পড়ে বাম দিকে।
ভূমি গলে গিয়ে নিচে নেমে যায়।
ঠিক তখনই… বাতাস কেঁপে ওঠে।
এক মুহূর্ত… দুটো আলো, তারপর এক ঝলক চিৎকার!
আবির ফিরে আসে।
তার শরীরের অর্ধেকটা এখন সম্পূর্ণ হীরার তৈরি, একদম পাথরের মতো কড়া ও রঙিন।
তার পা যেন বাতাস ছিঁড়ে চলে, গতি আর গতি।
সে মেল্টিক্সের দিকে ধেয়ে আসে—
এক ঘুষিতে সময় বিকৃত হয়ে ছিঁড়ে যায় তার চারপাশ।
মেল্টিক্স হালকা পিছিয়ে পড়ে।
প্রথমবার তার চোখে ভ্রু কুঁচকে ওঠে।
"তুমি… ফিরে এসেছো?"
আবির নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।
"আমি তোমার সময়ের বাইরে গিয়ে শিখেছি—সময়ই সব না।
বন্ধুতা, বিশ্বাস, আর লড়াই—এগুলোও সময়ের ঊর্ধ্বে।"
এবার লড়াই নতুনভাবে শুরু হয়।
কদির পাথর থেকে তৈরি করে এক ধরণের অস্থায়ী ফোর্স ফিল্ড,
আর আবির তার হীরার শরীর দিয়ে গঠন করে এক আলোক তরঙ্গ ঢাল।
মেল্টিক্স আক্রমণ করে, বারবার।
কিন্তু এবার সে টের পায়…

এই দুই ছেলেই আর সাধারণ নয়।
এরা এসেছে সময় ছিঁড়ে—
নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজে গড়তে।

অধ্যায় ২২

মেল্টিক্স তার ত্রিভুজ অস্ত্র ঘুরিয়ে ছুড়ে দেয় এক ঝলক বিকৃত শক্তি। আঘাতে আকাশের রঙ বদলে যায়—নীল থেকে ধূসর, ধূসর থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন রক্তিম।
আবির লাফিয়ে সামনে এসে ঢাল তোলে। হীরার মতো শক্ত সেই রঙিন শীলা সজোরে ধাক্কা খায়, আর আঘাতের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
কদির পিছন থেকে ফোর্স ফিল্ড জারি রাখে।
তার পাথর জ্বলছে রক্তাভ আলোয়, যেন ভেতরে কিছু নতুন জাগছে।
“এভাবে বেশিক্ষণ চলতে পারবে না,” এলিয়ন গম্ভীর গলায় বলে।
“মেল্টিক্স এখনও তার মূল শক্তি ব্যবহার করেনি।”
লুমিয়র ফিসফিস করে,
“ওর মূল শক্তি হলো Reality Slip—যা সে একবার করলে, কোনো অস্তিত্ব আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না।”
আবির তখন বলে,
“তাহলে আমাদের আগে আঘাত করতে হবে… তার Slip করার আগেই।”
মেল্টিক্স হঠাৎ থেমে যায়।
তার চোখে এখন আগের চেয়ে গভীর অন্ধকার।
সে ধীরে বলে,
“তোমরা চেষ্টা করো…
কিন্তু মনে রেখো—আমি একটি সময়ভ্রষ্ট ধারণা, আমাকে পরাজিত করতে গেলে তোমাদের নিজেকেই সময়ের অতীত করতে হবে।”
তার শরীর ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে ওঠে—Reality Slip শুরু হয়েছে।
আবির চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরের শক্তিকে কেন্দ্র করে।
“আমি সময়ের বাইরে যেতে পারি,” সে ভাবে, “কিন্তু ওর মতো অস্তিত্বের বাইরে যাওয়ার আগে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে ওকে ধরে রাখা যায়।”
হঠাৎ, কদির চিৎকার করে,
“আবির! খাতা!”
সে খাতা এগিয়ে দেয়।
খাতার ভেতরে এক অদ্ভুত বাক্য ফুটে ওঠে—
“তাকে থামাতে হলে, নিজের অস্তিত্ব স্থির করতে হবে এমন এক জায়গায় যেখানে সময় ঢুকতে পারে না।”
আবির সেটা পড়ে মুহূর্তেই বুঝে যায়।
সে নিজের গতি আবার বাড়িয়ে দেয়—
কিন্তু এবার সময় থেকে পালাতে নয়, বরং নিজেকে সময়ের কেন্দ্রে স্থির করতে।
চারপাশে সবকিছু স্থির।
এমনকি মেল্টিক্সও এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে যায়।
এই সুযোগে, আবির তার হীরার হাতে তৈরি করে এক বিশাল ত্রিশূল আকৃতির অস্ত্র—
এটা তার ফোর্সের প্রথম পূর্ণ রূপ।
সে সেই অস্ত্র ছুড়ে মারে মেল্টিক্সের বুকে।
এক বিকট আলোর বিস্ফোরণ।
মেল্টিক্স Reality Slip সম্পূর্ণ করতে পারে না—সে আংশিক রূপে ধরা পড়ে।
এক হাঁটু গেড়ে বসে সে বলে,

"তোমরা... সত্যিই সময় ছুঁয়ে ফেলেছো।"
কিন্তু লড়াই শেষ না।
সে উঠে দাঁড়ায়।
আস্তে আস্তে সে তার অস্ত্র ঘুরাতে থাকে।
এবং বলে—
"তোমরা আমাকে আটকে দিতে পারো, কিন্তু থামাতে পারবে না... যতক্ষণ না আমি নিজেই থামতে চাই '
এবং সেই সঙ্গে
মেল্টিক্স নিজের বিকৃত সময়ঘূর্ণির মাঝে ঢুকে পড়ে।
এক অদ্ভুত বিকৃত স্তরে চলে যায়—তাতেই সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।
এলিয়ন বলে,
"সে পালাল না,
সে প্রস্তুত হচ্ছে... পরের রূপে ফিরে আসতে।"
কদির নিচু গলায় বলে,
"তাহলে ওর সত্যিকারের পরাজয়... এখনও আসেনি।"
আবির ফিসফিস করে,
"তবুও, আজ আমরা সময়কে ছুঁয়েছি।"
তারা ধীরে ধীরে ওই বিকৃত শহর পেরিয়ে সামনে এগোয়।
কারণ তারা জানে—
মেল্টিক্স আবার আসবে।

অধ্যায় ২৩

মেল্টিক্স ধীরে ধীরে বাতাসকে ঘন করে তুলতে থাকে। তার শরীর জ্বলছে সময়ের রেখায়—পাথরের ছাদের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গলছে চারপাশ। কদির, আবির, এলিয়ন আর লুমিয়র চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে, পাথরের শক্তি দিয়ে একটা অস্থায়ী ফোর্স গঠন করার চেষ্টা করছে।
আবির বলে, "আমি আবার গতি বাড়াতে পারি, কিন্তু ও এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।"
লুমিয়র ফিসফিস করে, "ও এখন শুধু বিকৃত সময় নয়... বাস্তবতার বাইরের কিছু হয়ে গেছে।"
মেল্টিক্স মাথা নিচু করে বলে, "তোমরা বুঝতে পারো না, আমি তোমাদের অস্তিত্ব মুছে দিতে পারি। তোমরা জন্মাও, মরো... আর আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখি।"
কথা শেষ না হতেই সে এক ঝলক তরঙ্গ ছুড়ে দেয়—বাতাস ফেটে যায়, সময়ের রেখা এক মুহূর্তের জন্য পেছনে চলে যায়।
কদির ছিটকে পড়ে, খাতা তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে গুহার দেয়ালে ঠেকে।
আবির সামনে এসে দাঁড়ায়। তার বুকে হীরার আবরণ শক্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মেল্টিক্স তার অস্ত্র ঘুরিয়ে আনে—একটি বিশুদ্ধ বিকৃত সময়-ছুরি।
ছুরিটি ছোঁড়ার আগেই এলিয়ন এক ঝাপটে আবিরকে সরিয়ে দেয়।
ছুরিটি একটা পাথর ফেটে ভেতরের স্তর উন্মুক্ত করে। ভেতর থেকে গলে পড়া সময় ঝরে পড়ছে।
কদির ধীরে ধীরে উঠে আসে। পাথরটাকে শক্ত করে ধরে সে সামনে এগোয়।
পাথর এবার নিজে থেকেই এক ধরণের কম্পন শুরু করে—হালকা নীল আলো ফুটে উঠছে।
মেল্টিক্স থেমে যায়। তার চোখে ঝলক।
"এটা... অ্যাথারিয়ামের হৃদয়..." সে কাঁপা গলায় বলে।
"তোমরা জানো না, সেটা কাকে ধারণ করে আছে। আমি জানি।"
কদির জোরে বলে ওঠে, "তুই যা জানিস তাতে আমার কিছু যায় আসে না!"
এক ঝলক আলো পাথর থেকে বের হয়। মেল্টিক্স পিছিয়ে যায়, কিন্তু তার হাসি থামে না।
"তোমরা আজ আমাকে আটকে রাখলে... কিন্তু আমি তো ছিলাম, আছি, থাকবো... যতক্ষণ সময় আছে, আমি হারব না।"
সে তার চারপাশে সময়ের ফাঁদ তৈরি করে, বাতাস ঘুরে ঘুরে তাকে আবার ঢেকে ফেলে।

তার শরীর আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু সে মিলিয়ে যায় না।
শেষ মুহূর্তে সে বলে ওঠে,
"আমি আবার আসব—আর সেইবার, আমার ছায়া তোমাদের আত্মাতেও ঢুকবে।"
চারপাশ স্থির হয়, আলো ধীরে ধীরে নেমে আসে।
কিন্তু এই যুদ্ধের শেষ এখানেই নয়।
এটা কেবল বিরতি।

অধ্যায় ২৪

আকাশের রঙ বদলে যাচ্ছে—নীল থেকে বেগুনি, তারপর কালো।
Azterian Corridor-এর মাটির নিচে সময়ের স্তর গলছে, আর তার ভেতর থেকে উঠে আসছে সেই পরিচিত ছায়া—মেল্টিক্স।
তবে এবার সে পুরো রূপে।
আরও বিকৃত, আরও প্রবল।
তার দুই হাতেই সময়ের রেখা গঠিত—একদিকে সময় এগোয়, অন্যদিকে পেছায়।
মাঝখানে মেল্টিক্স, দাঁড়িয়ে।
আবির ফিসফিস করে,
"ওর শক্তি এখন সময়ের বাইরে… আমরা দেরি করলে আর কিছুই থাকবে না।"
কদির তার পাথর তুলে বলে,
"তাহলে আর অপেক্ষা কেন?"
পাথর জ্বলে ওঠে—অ্যাথারিয়ামের শক্তি এবার স্থির নয়, প্রবাহিত।
এক ঝলক মহাজাগতিক ফোটন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।
লুমিয়র আকাশে ওড়ে, এলিয়ন তার তলোয়ার প্রস্তুত করে।
আবির তার গতি ব্যবহার করে এক মুহূর্তে ঘিরে ফেলে মেল্টিক্সকে।
কিন্তু এবার সে হাসে।
"তোমরা ভাবছো, আমি কেবল সময়ের দাস?
না… আমি তো নিজেই এক ধারাবাহিক বিকৃতি।
তোমরা যতই গঠন করো, আমি ততই ভাঙবো।"
সে এক তর্জনী উঁচিয়ে দেয়।
চারদিক ফেটে যায়—নগরীর স্তর একের পর এক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
সময় উল্টে যাচ্ছে, বাস্তবতা পেছনে হাঁটছে।
কিন্তু কদির তার পাথরের শক্তি স্থির করে।
পাথর থেকে বের হয় এক বিস্তৃত রশ্মি—ফোর্স ফিল্ড নয়, এবার এক নতুন সত্তা।
এক বিশাল ছায়াপ্রাণী, যার গায়ে মহাজাগতিক আলো, চোখ দুটি হীরার মতো ঝলমলে।
নামহীন বিস্ট—অ্যাথারিয়ামের আত্মিক প্রতিরূপ।
তার এক চিৎকারে সময় থমকে যায়।
মেল্টিক্স থমকে দাঁড়ায়।
"এটা… কে?"
আবির বলে, "তুই সময়ের বিকৃতি? এটা সময়ের প্রতিরক্ষী।"
সেই বিস্ট এক লাফে মেল্টিক্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
তার হাত দিয়ে শোষিত হতে থাকে মেল্টিক্সের সমস্ত শক্তি—সময়, বাস্তবতা, বিকৃতি—সব কিছু।
মেল্টিক্স কাঁপে। প্রথমবার… সে আতঙ্কিত।
সে চিৎকার করে ওঠে,
"না… এটা আমার ছিলো! আমি ছিলাম এই শক্তির একমাত্র ধারক!"

কিন্তু শক্তি টেনে নিয়ে, বিস্ট চুপচাপ মেল্টিক্সকে ফেলে দেয়।
মেল্টিক্স পড়ে থাকে ধ্বংসস্তূপে—একটি ক্লান্ত, নিঃশক্ত, দৃষ্টিহীন সত্তা।
তার সময়ের রেখাগুলো ভেঙে পড়েছে। অস্ত্র নেই। ফাঁপা চোখে তাকিয়ে আছে চারদিকে।
এক মুহূর্তের জন্য চারপাশ নিস্তব্ধ।
তারা ভাবে—এটা শেষ।
কিন্তু ঠিক তখনই…
আকাশ কালো হয়,
বাতাস থেমে যায়।
এক দীর্ঘ কালো ছায়া ধীরে ধীরে নামে আকাশ থেকে।
চরণ পড়ে মাটিতে—ধ্বনিত হয় এক শব্দ, যেটা বাস্তবতাকেও কাঁপিয়ে তোলে।
একটি বিশাল ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে। তার মুখ ঢাকা, তার শরীর ম্লান, তার চোখ অন্ধকারের গহ্বর।
লুমিয়র ফিসফিস করে,
"এটা… এটা কি..."
এলিয়ন হতভম্ব,
"আমি… আমি তো কখনো ওকে দেখিনি… কিন্তু এই শক্তি… এটা তো… স্টোভাটর!"
সবার দৃষ্টি স্থির।
কদিরের পাথর থেমে যায়।
মেল্টিক্স ধীরে উঠে দাঁড়ায়—কাঁপা কন্ঠে বলে,
"তুমি… সত্যিই এসেছো?"
সেই সত্তা এগিয়ে আসে। তার কন্ঠ—নিম্ন, কর্কশ, অথচ সম্মোহনী।
"তুমি আজ হেরেছো, মেল্টিক্স। কারণ তুমি ভুলে গেছো—তুমি একা নও।"
সে এক ইশারায় বাতাস ছিন্ন করে।
মেল্টিক্স ধীরে ধীরে সেই ছায়ার দিকে এগিয়ে যায়।
কোনো শব্দ নেই,
কোনো যুদ্ধ নেই,
শুধু নীরবতায় এক পরাজিত সত্তা
আর এক নতুন ছায়া।
কদির চুপ। আবির থমকে।
লুমিয়র ও এলিয়নের চোখে একটাই প্রশ্ন—
এই ছায়া... আসলেই কি স্টোভাটর?
নাকি… নতুন এক মহাসংকটের সূচনা?

অধ্যায় ২৫

ধ্বংসস্তূপের মাঝে নিঃশক্ত পড়ে থাকা মেল্টিক্সকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তিটি। তার দীর্ঘ পরিহান ভেসে থাকে বাতাসে, আর চোখ—যেন দিকহীন গভীর গহ্বর।
আকাশ অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ।
কদির ধীরে ধীরে সামনে এগোতে চায়, কিন্তু লুমিয়র তার পথ আটকে বলে, "থামো। তুমি টের পাচ্ছো না, কীভাবে জায়গাটার ভার পাল্টে গেছে?"
এলিয়ন তলোয়ার উঁচু করে বলল, "তুমি কে?"
সত্তাটি ধীরে ধীরে মুখ তোলে। মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কন্ঠটা যেন কাঁপিয়ে তোলে বাস্তবতাকেও।
"আমি… সেই অন্ধকার, যে নিজের নাম মনে রাখে না।
তবে তোমরা চাইলে, আমাকে স্টোভাটর বলেই ডাকো।"
লুমিয়রের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

এলিয়ন এক কদম পিছিয়ে আসে।
আবির ফিসফিস করে, “তোমরা ওকে চিনো না?”
“না,” লুমিয়র বলে, “তবে এই নাম… এই কম্পন… এটা যাকে বোঝায়, সে কেউ নয়—কিছু।”
স্টোভাটর মেল্টিক্সের দিকে ফিরে যায়।
“তুমি এখন বোঝো, সময় দিয়ে যা তৈরি করা যায়, তা সময়েই বিলীন করা যায়। এবার চলো।”
এক স্পর্শে মেল্টিক্সের নিঃশক্ত দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়। কোনো শব্দ নেই, কোনো আলো নেই—শুধু শূন্যতা।
কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে সে ঘুরে দাঁড়ায়।
তার দৃষ্টি এবার কদির, লুমিয়র, এলিয়ন ও আবিরের দিকে।
“তোমরাই ওকে ভাঙলে?”—তার কণ্ঠে যেন সাপের ফোঁস।
তারা কোনো উত্তর দেয় না।
ঠিক তখনই—সে আঘাত করে।
না কোনো অস্ত্র, না কোনো ইশারা—
শুধু এক দৃষ্টির স্পন্দনেই
লুমিয়র ছিটকে পড়ে পাথরের স্তরে।
এলিয়ন বুক চেপে মাটিতে গড়ায়, রক্ত ঝরছে মুখ থেকে।
কদির শক্তি হারিয়ে পাথরের খোঁপে ধাক্কা খায়—ক্রিস্টাল পড়ে যায় হাত থেকে, গড়াতে গড়াতে থামে আবিরের পায়ের সামনে।
আবির বিস্ময়ে চেয়ে থাকে—তার চারপাশে এখন কেবল ধ্বংস।
স্টোভাটর ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসে।
“তোমার গতি তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।
তোমার ভিতরে এখনো ভয় নেই, কিন্তু তুমি শিখে যাবে।”
আবির দাঁড়িয়ে যায়। তার হীরার শরীর টনটন করে কাঁপে, রঙ বদলায়।
সে পেছন ফিরে তাকায়—কদির অচেতন, আর এলিয়ন আর লুমিয়র সাড়া দিচ্ছে না।
স্টোভাটরের ছায়া নেমে আসে তার গায়ের উপর। তার চারপাশের সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে।
আবির নিঃশ্বাস নেয় একবার।
তারপর…
এক ঝলকে
সে ক্রিস্টাল অফ অ্যাথারিয়াম হাতে তুলে নেয়,
লুমিয়র ও এলিয়নকে একসাথে টেনে নেয় ক্রিস্টালের মধ্যে,আর কদিরকে কোলে তুলে নেয়।
তার চোখে একটাই সিদ্ধান্ত—
পালাতে হবে। এখনই।
স্টোভাটর হাত বাড়ায়,
কিন্তু আবির গতি তখন ছাড়িয়ে দেয় সীমা।
পায়ের নিচে মহাজাগতিক রেখা তৈরি হয়,
বাতাস পেছনে পড়ে যায়।
তার গতির সীমা ভেঙে সময়কেও পেছনে ফেলে।
ধ্বংসস্তূপ থেকে
গভীর অরণ্যের ভিতরে
অজানা এক শূন্যতায়
আবির নিজে আর তিনজনকে লুকিয়ে রাখে—ক্রিস্টালের ভিতর।
ক্রিস্টালের আলোর ভেতর সময়ও ঢুকতে পারে না।
আবির হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে।
তার সামনে অচেতন কদির।
ক্রিস্টালের শক্তি এখন শান্ত।

তার পাশে শুয়ে থাকা এলিয়ন আর লুমিয়রের বুক ধীরে ধীরে ওঠানামা করছে—তারা বেঁচে আছে, কিন্তু ভীষণভাবে আহত।
আবির ফিসফিস করে বলে,
“আমি পারলাম… কিন্তু আমি জানি না আর কতক্ষণ…”
ক্রিস্টালের ভেতর অন্ধকার।
আর বাইরের পৃথিবীতে
স্টোভাটর এখন ছায়া গড়ে তুলছে—
নতুন শিকার খুঁজে।

অধ্যায় ২৬

বাতাস কাঁপছে।
আকাশ যেন নিঃশ্বাস আটকে আছে।
স্টোভাটর দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের মাঝে, যেখানে কিছুক্ষণ আগেই ছিল মেল্টিক্সের পতন আর এক ঝলক বিদ্যুৎগতিতে চারজনের পালিয়ে যাওয়া।
সে নিচু স্বরে ফোঁস করে ওঠে।
“তাড়াহুড়ো করলি, ছোট্ট দৌড়বিদ…
পালিয়ে বাঁচতে চাস?
ঠিক আছে।
তোর গতি তোকে অনেক দূর নেবে।
…কিন্তু সময় তো আমার হাতেই।”
তার হাত উঠতেই বাতাস ছিঁড়ে যায়, এবং নিঃশব্দে, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে একধরনের অদৃশ্য নেটওয়ার্ক—সময়ের ফাটল।
“তোমাদের লুকোবার জায়গা আমি বানাইনি,”
সে বলে,
“তাহলে আমি কেন খুঁজে পাবো না?
ক্রিস্টালের অভ্যন্তরে নেমে এসেছে অস্থির এক নিস্তব্ধতা।
কদির ধীরে ধীরে চোখ মেলে। মাথার পেছনে ব্যথা, শরীরের শক্তি প্রায় শেষ। তার সামনে আবির হাঁটু গেঁড়ে বসে, মুখ ঘামে ভেজা। পেছনে অচেতন লুমিয়র আর এলিয়ন।
“আমরা… কোথায়?”
আবির উঠে দাঁড়ায়, মুখে ঠান্ডা অ্যাটিটিউড।
“বেঁচে আছি, এই তো যথেষ্ট।”
কদির ধীরে ধীরে উঠে বসে, ফিসফিস করে,
“ওটা… স্টোভাটর?”
আবির জবাব দেয় না, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে,
“যে ছিল, সে আমাদের ছায়ায় ঢুকে পড়েছে।
আমরা পালিয়েছি… কিন্তু এটা জেতা না।
এটা ছিল… পেছিয়ে আসা, সামনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে।”
কদির পাথরটিকে তুলে ধরে।
পাথরের ভিতর এখন যেন নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে কিছু।
“এটা… এখনও কাজ করছে?”
“না,” আবির বলে, “এটা এখন বিশ্রামে আছে। তুইও থাক। আমি দাঁড়ালেই ভেঙে পড়বি।”
কদির হেসে ফেলে।
“তুই তো দেখি গতি পেয়েই অ্যাটিটিউড ধরে ফেলছিস।”

আবির চোখ ছোট করে বলে,
“যেইদিন কেউ আমার স্পিড মাপতে পারবে, সেদিন আমি দাঁড়াতে শিখব।
ততদিন আমি দৌড়াবো—তোদের জন্য।”
পেছন থেকে লুমিয়র কেশে ওঠে।
“দুইজনের নাটক শেষ?
আমরা এখনও সেই ছায়ার ধোঁয়ার ভিতর, আর ও এখনো খুঁজছে আমাদের।
স্টোভাটর, না স্টোভাটরের ছায়া—যেই হোক, ও জানে আমরা কোথাও আছি।
তাই এখন শুরু হবে আসল খেলা।”
কদির বলে, “তাহলে আমাদের পরের পদক্ষেপ?”
আবির পাথরের দিকে তাকিয়ে বলে,
“শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে।
আমাদের নিজেদের তৈরি করতে হবে এমন এক যুদ্ধে…
যেখানে সময়, গতি, অস্ত্র—সবকিছুই ব্যর্থ হতে পারে।”
লুমিয়র বলে,
“আর আমাদের সামনে আসছে এমন এক সত্তা—
যে নিজেকে স্টোভাটর বললেও, ওর চোখে আমি দেখেছি… কিছু লুকানো আছে।
ও আসল না।
কিন্তু ভয়াবহ? হ্যাঁ, ও ভয়াবহ।”
কদির পাথর শক্ত করে ধরে।
“তাহলে এবার আমরা পালাবো না।
আমরা প্রস্তুত হবো।
এবং যখন ও আসবে… ওর সামনে দাঁড়িয়ে,
বলব—তুই তো আসল স্টোভাটরই না।”
আবির মাথা ঝাঁকায়।
“তোর লাইনটা ভালো ছিল।
তবে বলার আগে…
চল, একটু যুদ্ধ অনুশীলন করি।
এই স্পিড তো এমনি এমনি বাড়ে না।”
তাদের চোখে জ্বলে ওঠে নতুন লড়াইয়ের আগুন।
আর ক্রিস্টালের বাইরে…
ছায়া ঘন হতে শুরু করে।

অধ্যায় ২৭

জঙ্গলভরা এক পরিত্যক্ত পাহাড়ি উপত্যকার গুহায়, সময় যেন থেমে আছে।
তিনজন কিশোর—একজন অচেতন, দুইজন জেগে—এবং এক প্রাচীন ক্রিস্টাল তাদের চারপাশে জেগে আছে, যেন এক নীরব পাহারাদার।
কদির পাথর হাতে বসে আছে এক কোণে। তার চোখে ক্লান্তি নেই, আছে একধরনের স্থিরতা। ভিতরে কিছু গুনগুন করছে, যেন কিছু ডাকছে… অথবা গুঞ্জন দিচ্ছে ভবিষ্যতের ছায়া।
আবির বাইরে পাহারা দিচ্ছে। গুহার প্রান্ত থেকে সে দেখতে পাচ্ছে, আকাশে এখনও ছড়িয়ে আছে ছায়ার ফাটল—যেখানে সময় ঠিকভাবে চলতে পারে না।
ওই দূরে, অচেনা কালো রেখাগুলো হঠাৎ হঠাৎ কাঁপে, যেন কেউ তাদের ঘেঁটে দিতে চায়।
“ও এখানে আসছে,” আবির ফিসফিস করে।
পেছনে এলিয়ন এসে দাঁড়ায়। মুখে ক্ষত, হাতে ব্যান্ডেজ।

“ও ঠিক কী চায়?”
“পাথর,” আবির সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। “আর আমাদের ভয়। কিন্তু আমি ওকে কিছুই দিতে রাজি না।”
ভেতরে, কদির ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।
তার হাতে পাথর জ্বলে উঠছে, ধীরে ধীরে।
সে বাইরে এসে বলে, “এই পাথর... এখনও পুরোপুরি জাগেনি। কিন্তু ও বুঝতে পারছে আমরা পালিয়ে এসেছি। এখন আমাদের পালানো না—ওকে আটকাতে হবে।”
লুমিয়র একদিকে তাকিয়ে বলে, “তাহলে শুরু হোক। তবে এবার আমরা শুধু আঘাত করব না... এবার আঘাত রেখে যাব।”
পাহাড়ি উপত্যকার নিচে একটি কুয়ো।
তার নিচে এক মসৃণ গ্যালারিতে আলো ছড়িয়ে পড়ছে ক্রিস্টাল থেকে।
কদির ওখানে দাঁড়িয়ে পাথরটি সামনে ধরে।
“তুই আমার কথা বুঝিস তো?” সে ফিসফিস করে।
পাথর নরম আলো ছড়ায়। একটি দাগ গায়ে জ্বলতে থাকে, তারপর মিলিয়ে যায়।
কদির বুঝে যায়, তার ডাকে সাড়া এসেছে।
এই পাথরের ভেতরে এখন শুধু অ্যাথারিয়ামের শক্তি নেই...
আছে আরও কিছু—অদৃশ্য, পুরাতন, এবং জেগে উঠতে ইচ্ছুক।
ওদিকে, এক শূন্য মরুভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ছায়ামূর্তি—স্টোভাটর।
তার সামনে বাতাসে ভাসছে এক অদ্ভুত কাচের বল। তার ভিতরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এক চিত্র—কদির, আবির, এলিয়ন আর লুমিয়র।
“ওরা গর্তে ঢুকেছে।
ভাবছে, আমি অন্ধ?
অন্ধকার যখন হাঁটে, আলো নিজেই পথ দেখায়।”
সে ধীরে ধীরে পায়ের নিচে কালো রেখা ছড়িয়ে দেয়—একটা ছায়া-নেটওয়ার্ক, যা ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তের পাথরের নিচে, বাতাসের ধুলোয়, আর গাছের পাতায়
আর তখনই গুহার মাটির নিচে কেঁপে ওঠে মাটি।
কদির উপরের দিকে তাকায়।
“ওর ছায়া নিচে পৌঁছে গেছে।”
আবির এক ধাক্কায় এলিয়নকে পেছনে সরিয়ে দেয়।
“তাহলে শেষ চেষ্টা?”
কদির মাথা নাড়ে।
“শেষ না... শুরু।
এইবার আমরা পথ বানাবো, ওর গায়ে ছাপ রেখে।”
তার হাত জ্বলে ওঠে।
ক্রিস্টাল এবার পাথরের মতো নয়—এটা একটা অস্ত্র।
আর তারা প্রস্তুত—না পালানোর জন্য,
বরং জবাব দেওয়ার জন্য।

অধ্যায় ২৮

ভোর আসেনি, কিন্তু আলো জ্বলছে।
গুহার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত রঙের আভা—নীল, বেগুনি, আর রক্তরঙের ছায়া। যেন সূর্য ওঠার আগে অন্ধকার শেষবার নিজেকে মেলে ধরছে।
আবির মাটিতে এক হাঁটু গেড়ে বসে। তার হাতের আঙুল ছুঁয়ে আছে মাটি—তার গতি এখন শুধু গতির জন্য নয়, সে অনুভব করছে চারপাশের কাঁপুনি।

“ও খুব কাছেই,” সে বলে।
লুমিয়র এক ঝলকে তরবারি ঘোরায়, বাতাসে ছায়া কেটে ফেলে।
“ওর ছায়া আমাদের ঘিরে ফেলেছে। আলো এখন ভিতর থেকে আনতে হবে।”
এলিয়ন এবার কিছুটা সুস্থ, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
সে বলে, “তাহলে আজ যুদ্ধ শুরু। আমরা ছায়ার নিচে এসে দাঁড়াবো না, ছায়ার ভেতর থেকেই ওকে কেটে ফেলবো।"
অন্যদিকে, উপত্যকার নিচে ছড়িয়ে পড়ছে কালো ছায়ার জাল।
স্টোভাটর ধীরে ধীরে সামনে বাড়ে। তার শরীর কোনো সুনির্দিষ্ট আকৃতির নয়—স্রেফ এক গাঢ় রঙ, যেন অন্ধকারকে রঙ বানিয়ে পরা হয়েছে।
তার কন্ঠ ভেসে আসে—না শব্দে, বরং মনে।
“তোমরা আলো ধরেছো, আর আমি… আলোকে ভুলিয়ে অন্ধকার বানাই।
তোমরা পালাও, আমি দাঁড়াই।
তোমরা চাও শক্তি, আমি জন্ম দিই… ভয়কে।”
তার পায়ের নিচে যে জায়গায় সে পা ফেলে, সেখানে জমে ওঠে কুয়াশার মতো ধোঁয়া।
তার ভেতর দিয়ে গাছ শুকিয়ে যায়, পাথর চূর্ণ হয়, আর বাতাস থেমে যায়।
কদির সামনে এগিয়ে আসে।
তার ডান হাতে ক্রিস্টাল, যা এখন চুপচাপ… কিন্তু জাগ্রত।
তার বাম হাতে গড়ে উঠছে এক নতুন গ্লাভস—অ্যাথারিয়ামের শক্তি দিয়ে গঠিত একধরনের শক্তিবর্ম।
সে বলে, “ওকে এখানেই থামাতে হবে। কারণ ও যদি পায় জেগে থাকা অ্যাথারিয়ামকে—তাহলে সব শেষ। সব কল্পনা, সব বিস্ট, সব বাস্তবতা।”
আবির হালকা হাসে, “তুই প্ল্যান করিস। মারামারির দায়টা আমার।”
গুহার সামনে এসে ছায়ার নিচে নেমে আসে স্টোভাটর।
তার চোখ নেই, তবু তারা জানে সে তাকিয়ে আছে।
“তোমরা দাঁড়িয়ে আছো… শেষ যুদ্ধের আগে,” সে বলে।
কদির জবাব দেয় না।
সে এগিয়ে এসে কেবল একটি বাক্য বলে—
“তোর ছায়া যদি সব ঢাকে, তাহলে আজ আমরা ছায়ার ভিতর থেকেই আগুন জ্বালাবো।”
তারপর শুরু হয়।
বাতাস ছিঁড়ে যায় আবিরের গতি থেকে,
লুমিয়র আর এলিয়নের অস্ত্র ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে,
আর কদির, পাথরের শক্তি ছুঁড়ে দেয় সময়ের কণিকায়।
একটা ধাক্কা।
তারপর আরেকটা।
স্টোভাটর দমে যায় না।
তার ছায়া বড় হতে থাকে, বিস্তৃত হতে থাকে পুরো আকাশে।
কিন্তু এবার
ছায়ার মাঝখানে
একটি আলো জন্ম নেয়—
একটা ফাটল, যা ভিতর থেকে ছিন্ন করে অন্ধকারকে।
সেই আলো ক্রিস্টাল থেকে নয়,
তাদের থেকে বেরিয়ে এসেছে।
তাদের দৃষ্টিতে, সিদ্ধান্তে, একত্রে দাঁড়ানো ইচ্ছায়।
এখন তারা যুদ্ধ করছে না বাঁচার জন্য,
তারা যুদ্ধ করছে ওকে থামানোর জন্য।
আর স্টোভাটর—

প্রথমবার, এক ধরণের বিরক্তিতে ফিসফিস করে ওঠে…
“তোরা… সময়ের বাইরে যাচ্ছে।”

অধ্যায় ২৯

ছায়া এখন আকাশ ছুঁয়েছে।
পাহাড়, গাছ, মাটি—সব এক রকম কালচে ঝাপসা হয়ে আছে, যেন বাস্তবতা নিজেই মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।
স্টোভাটর মাঝখানে দাঁড়িয়ে।
তার শরীর একটানা নড়ছে না, কিন্তু তার ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে চক্রাকারে, যেন পুরো জায়গাটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে সে।
আবির ছুটে আসে সেই অন্ধকার ভেদ করে—তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করতে পারছে হাওয়ার গতি আর মাটি ফেটে যাওয়ার শব্দ।
সে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায়।
দূর থেকে ছুটে আসা ধুলোর ঢেউ চূর্ণ হয়ে পড়ে তার পায়ের সামনে।
তার শরীরের দুই হাত থেকে বেরিয়ে আসছে রঙিন হীরার মতো গঠন, একরকম জ্যোতির্ময় শক্তির শিলা, যা দিয়ে সে এক হাতে ঢাল তৈরি করছে, অন্য হাতে তলোয়ার।
স্টোভাটর তাকে দেখে বলে,
“তুই আবারও সামনে এলি? ভেবেছিলি গতি তোকে আলাদা করবে?”
আবির ঠান্ডা চোখে তাকায়।
“তোর ছায়া অনেক বড়, কিন্তু ছায়া তো আলো ছাড়া জন্মায় না। তুই নিজেই আসলে ভয় পাস আলোর।”
সে ছুটে আসে—এবার গতির চেয়েও দ্রুত, সময়ের বাইরে গিয়ে আঘাত নামায়,
তলোয়ার ছায়া ফুঁড়ে স্টোভাটরের বুক ছুঁয়ে যায়, কিন্তু তার শরীর ছায়ার মতোই ফাঁকা।
এক মুহূর্তে, স্টোভাটরের হাতে থেকে বের হয় কালো তরলধারা—ঘূর্ণায়মান, পিচ্ছিল, সময়ঘাতী।
তা আবিরকে ছুঁয়ে যেতে না যেতে,
এক উল্টা ঘূর্ণির ভেতর থেকে লাফ দিয়ে আসে লুমিয়র।
তার তরবারি আগুনের মতো জ্বলে ওঠে,
এবং সে সোজা কাটে সেই তরলধারার গতিপথ।
এলিয়ন পেছন থেকে মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে এক আকাশচুম্বী শিলাস্তম্ভ তুলে আনে—যেটা ছুঁড়ে দেয় স্টোভাটরের দিকে।
স্টোভাটর অম্লান।
সে শুধু দুই হাত বাড়িয়ে ফিসফিস করে,
“ভয় করো না… এবার সত্যি করে হারাও।”
তার চারপাশে ছায়া ঘূর্ণিপাক হয়ে তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ ঘটায়।
এক ঢেউয়ে তিনজনই ছিটকে পড়ে।
গুহার ভিতরে, কদির এবার পাথরটা দুই হাতে ধরে ফিসফিস করে,
“আমাকে আরেকটু… কেবল আরেকটা স্পন্দন দাও।”
পাথর হালকা কম্পন করে।
তার বুক থেকে উঠতে থাকে রঙিন রেখা,
যা উঠে এসে কপালে এসে থামে।
তার শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একধরনের মিশ্র আলো—নির্বাক, কিন্তু নিঃশেষ নয়।
সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়,
আর তার পেছনে পাহাড়ের দেওয়ালে গঠিত হয় এক নক্ষত্রমণ্ডলের চিহ্ন।
“আলো… আসছে।”
আর তখনই…
আকাশ কেঁপে ওঠে।
স্টোভাটরের ছায়া থেমে যায় এক মুহূর্তের জন্য।

সে মাথা তোলে।
তার চোখের সামনে পাথরটা জ্বলছে,
আর কদির ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে তিনজন আহত সাথীকে ডিঙিয়ে সামনে।
কদির চোখে এখন কোনো দ্বিধা নেই।
সে বলে না কিছু,
শুধু পাথরটা তুলে ধরে—আর তার শরীরের চারপাশে যেন এক প্রাচীন ভারসাম্যের বলয় তৈরি হয়।
আলো আর ছায়ার সংঘর্ষ এখন সময়ের বাইরে।
আর এই বার, স্টোভাটর—
এক কদম পিছিয়ে যায়।

অধ্যায় ৩০

মাটি আর আকাশের মাঝখানে যেন কিছু থেমে গেছে।
কদির দাঁড়িয়ে আছে—তার চারপাশে রঙিন আলোদের দপদপ শব্দে তৈরি এক বলয়। পাথরটা তার হাতের মাঝে জ্বলছে না, বরং নিঃশব্দে নিঃসরণ করছে একধরনের ভারসাম্য, যা অন্ধকারকে থামিয়ে রাখে।
স্টোভাটর তাকিয়ে আছে সেই বলয়ের দিকে।
তার ছায়া আর আগের মতো ছুটে যাচ্ছে না, যেন কোনো শক্তি তাকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে।
“তুই এবার জেগে উঠেছিস,” সে বলে।
“তবে তোর শক্তি এখনও ভেতরেই আছে।
তুই কেবল স্পর্শ করছিস আসল অস্ত্রের দরজায়।”
কদির চুপচাপ সামনে এগোয়।
পেছনে আবির, লুমিয়র, এলিয়ন তিনজনই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।
তাদের শরীর জর্জরিত, কিন্তু চোখে একই সিদ্ধান্ত।
“তুই ভাবছিস আমরা হারবো,” কদির বলে, গলা নিচু, কিন্তু স্পষ্ট।
“কারণ তোর শক্তি বেশি।
কিন্তু তুই ভুল বুঝছিস…
আমরা যতবার ভেঙে পড়েছি, ততবার নতুন করে দাঁড়িয়েছি।”
স্টোভাটর এবার অদ্ভুতভাবে হাসে।
“আমি দেখতে চাই তোর বিশ্বাস আর পাথরের শক্তি—কে আগে ভেঙে পড়ে।”
তার হাত তুলে, আকাশের দিক দেখায়।
উপরে দেখা যায় এক ছায়াময় ফাটল, যার মধ্যে দিয়ে গলে পড়ছে অন্ধকার তরল,
যা ধীরে ধীরে নিচে আসছে—আর তার মাঝখানে,
একটা অবয়ব তৈরি হচ্ছে।
নতুন, কুয়াশামাখা, রাক্ষসের মতো কিছু।
এক বিশাল ছায়া-পশু, যার গায়ে আগুনের মতো কালো রেখা, চোখে ধোঁয়া।
“এটা আমার নতুন সৃষ্টি,” স্টোভাটর বলে।
“এটা তোমাদের আলোর বিরুদ্ধে আমার প্রতীক।”
লুমিয়র এগিয়ে আসে।
তার হাতে তলোয়ার, শরীর ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু মুখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই।
“তুই যা আনিস, আন,” সে বলে।
“আমরা জানি শেষ হবে কোথায়।”
আবির এবার কাঁধের উপর থেকে ড্যাশ করে সামনে এগিয়ে আসে।
তার দুই পায়ে গড়ে উঠেছে মহাজাগতিক শীলা,
যার থেকে রঙ বের হচ্ছে যেন তরল বিদ্যুৎ।

“আমি প্রথম ধাক্কা দেবো,” সে বলে,
“তোর ছায়া এবার সময় ছাড়িয়ে গিয়ে কাঁপবে।”
তাদের সামনে দাঁড়ায় কদির।
সে চোখ বন্ধ করে।
পাথর এবার ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে না, বরং আকার নিচ্ছে।
একটি নীলস্রোত বর্ম তার বুক ঘিরে ধরে,
তার দুই হাতে তৈরি হয় একপ্রকার স্ফটিক-চেইন,
যা আলো ও সময়ের মাঝে এক সেতু।
তার চোখ খুলতেই দেখা যায়:
সে এখন আর শুধু কদির না।
সে অ্যাথারিয়ামের উত্তরাধিকার।
আর তখনই ছায়াপশু গর্জে ওঠে।
মাটি ফেটে যায়, আকাশে বিদ্যুৎ—অন্ধকার আর আলো পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসে।
আর যুদ্ধ শুরু হয়।
এক নয়, দুই নয়—তাদের চারজনের সম্মিলিত শক্তি ছায়ার বিরুদ্ধে একসাথে আঘাত করে।
মেল্টিক্স ছিল আগুন।
স্টোভাটরের এই সৃষ্টি ছায়া ও আগুনের মিলন।
কিন্তু এবার, ওরা চারজন...
আলোকের চেয়েও বেশি কিছু।
তারা হলো—প্রতিরোধ।

অধ্যায় ৩১

ছায়ার ভিতরেও শব্দ হয়।
এক বিকট গর্জনে পুরো উপত্যকা কেঁপে উঠল।
স্টোভাটরের ছায়া-পশু দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—তার বিশাল পা মাটি ছিঁড়ে ফেলে, চোখে জ্বলছে লাল ছায়া-শিখা।
কদির সামনে এসে দাঁড়াল, তার গায়ে জ্বলে উঠল সেই স্ফটিক বর্ম।
ডান হাতে ক্রিস্টালের চেইন, বাম হাতে আলো-ঢাল।
তার চারপাশে হালকা সময়বিকৃতি দেখা যাচ্ছে—সে নিজে এখন বাস্তবের চেয়ে এক চুল ধারে দাঁড়িয়ে।
আবির, তার গতি বাড়িয়ে, শিলার পায়ের ওপর ছুটে এলো।
এক ঝটকায় সে সময় ছাড়িয়ে ছায়া-পশুর ঘাড়ে আঘাত হানল—তার হীরার মতো শীলা-তলোয়ার ঘাড়ের একপাশে সরে গিয়ে ছায়া ছিঁড়ে দিল।
পশু চেঁচিয়ে উঠল, আর তার লেজ যেন বজ্রের মত করে ঘুরে এলিয়নের দিকে ছুটে গেল।
এলিয়ন আকাশে লাফ দিয়ে মাটি ফাটিয়ে এক জায়ান্ট শিলাস্তম্ভ তুলে আনল—তাকে ঢাল বানিয়ে সে ঠেকিয়ে দিল সেই ধাক্কা।
ধাক্কা এত তীব্র ছিল যে এলিয়ন পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল।
লুমিয়র এবার সামনে এলো, দুই হাতে জ্বলন্ত তলোয়ার।
সে ছায়া-পশুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল,
“এইবার আমি আলোর গায়ে ছাপ রেখে যাবো।”
সে এক লাফে পশুর বুকে আঘাত হানল—তলোয়ার ছায়া ভেদ করে আগুনের রেখা ছাড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ কাঁপতে কাঁপতে ছিন্ন হয়ে গেল।
কিন্তু পশু থামে না।
তার শরীর থেকে ছায়া আবার গলে বের হয়ে সেই কাটা অংশ পূরণ করে—আর এবার, সে চারজনকে ঘিরে ফেলে।
ছায়া তাদের পায়ে পেঁচিয়ে যায়, আকাশ কালো হয়ে যায়, আর স্টোভাটর দূর থেকে ফিসফিস করে বলে—

“তোরা যাই করিস, আমি ফিরে আসবো।
কারণ আলো সবসময় শেষ হয়…
ছায়া থাকে।”
কদির চোখ বন্ধ করে।
তার ভেতরের পাথর কম্পন করছে, যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে।
তখনই, পাথর থেকে নেমে আসে একটা লাইন—তার পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।
সে চোখ খুলে দেখে, তার চোখে এখন ছায়া না—নক্ষত্র আছে।
সে বলে,
“তুই ফিরে আসবি?
তাহলে আমি এমন ছাপ রাখবো,
যা তোকে তোর ছায়ার মধ্যেও দেখতে দেবে—নিজের ভয়।”
সে হাত বাড়িয়ে সেই ছায়া-পশুকে চেইন দিয়ে বেঁধে ফেলে।
চেইন স্ফটিকের, কিন্তু সেটার গায়ে তার চিন্তা, বিশ্বাস, ভয়, ক্ষোভ—সব মিশে গেছে।
চেইনের এক টানে ছায়া-পশুর শরীরের মাঝখানটা ফেটে যায়।
আলো বের হয় ভিতর থেকে।
আর তখনই, এলিয়ন আর লুমিয়র একসাথে দুই দিক থেকে আঘাত করে।
আবির বাতাসে ঘুরে এক চূড়ান্ত গতি দিয়ে পশুর কপালে শিলার গজাল বসিয়ে দেয়।
পশুর গর্জন থেমে যায়।
আর তার ছায়া—বাতাসে ভেঙে পড়ে…
চূর্ণ হয়ে ছিটকে যায় আকাশের দিকে।
দূরে দাঁড়িয়ে থাকা স্টোভাটর এবার একবার তাকায়…
তার মুখে অভিব্যক্তি নেই।
সে ধীরে ধীরে পেছনে হাঁটে।
একবার সে পাথরের দিকে তাকায়, তারপর বলে—
“তোরা জিতলি না…
শুধু একটু সময় কিনলি।”
তারপর, এক ছায়া-ফাটলের ভেতর সে মিলিয়ে যায়।
আর চারজন…
একসাথে দাঁড়িয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে।
কিন্তু কদির জানে—
এটা কেবল একটা যুদ্ধ ছিল।
যুদ্ধের শেষে নয়…
শুরুতে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যায় ৩২

ঝড় থেমেছে, ছায়া কেটেছে।
কিন্তু বাতাসে এখনও সেই কিছুর গন্ধ—যেটা বাস্তব নয়, তবুও ভারি।
চারজন চুপচাপ পাহাড়ের কিনারায় বসে।
কোনো কথা নেই, শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। যেন সবাই নিজের ভিতরেই ফিরে গেছে।
আবিরের হাতের শীলা-ঢালটা আর নেই, গলে গিয়ে তার হাতে ঘাম হয়ে ঝরে পড়েছে।
লুমিয়রের তলোয়ার ভাঙা, এলিয়নের শিলাস্তম্ভ ফাটল ধরা, আর কদির—সে শুধু বসে আছে, পাথরটা হাতে নিয়ে।
এখন পাথরটা শান্ত।
কোনো আলো নেই, কোনো কম্পনও না।

একপ্রকার নিঃস্তব্ধতা, কিন্তু সেটা মৃত্যু নয়।
এটা বিশ্রামের আগে যুদ্ধের ঘুম।
“তুই ঠিক বলেছিলি,” এলিয়ন বলে, গলা শুকনো, “এটা শেষ নয়।”
আবির মাথা নাড়ে।
“না, এটা ছিল ওদের পাঠানো একটা ধাক্কা মাত্র।
ওরা বুঝতে চাইছে আমরা কতদূর যেতে পারি।”
লুমিয়র উঠে দাঁড়ায়।
তার গায়ে এখনও রক্ত, চোখে ক্লান্তি, কিন্তু কণ্ঠে আগুন।
“আমরা যদি এখানেই থেমে যাই, তাহলে অ্যাথারিয়ামের শক্তি কখনই জাগবে না।”
তখন কদির ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।
তার হাতের পাথর হালকা নীল রঙে জ্বলে ওঠে—এক ঝলকে, যেন কারও নিঃশ্বাস।
সে বলে না কিছু।
তারপর সে পেছনের দিকে হাঁটা দেয়—উত্তরের দিকে, যেখানে পাহাড়ের বাইরে একটা গহ্বর আছে।
সেইখানে নাকি এক পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।
একটা পথ…
যেটা অ্যাথারিয়ামের অতীতের দিকে যায়।
পেছন থেকে আবির বলে,
“তুই জানিস না ঠিক কী খুঁজতে যাচ্ছিস, তাই না?”
কদির থামে, কাঁধের উপর চোখ ঘোরায়।
“জানি না,” সে স্বীকার করে।
“কিন্তু আমি এটুকু জানি, পাথরটা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চায়।
এবং এবার, আমি আর পেছনে ফিরব না।”
তারপরে সে হেঁটে চলে যায়।
আকাশের কিনারায় সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করেছে,
আর দূর থেকে পাথরের ভেতর—
একটা নরম কন্ঠস্বর কদিরের মনের ভেতর ফিসফিস করে:
“তুমি প্রস্তুত হচ্ছো…
কারণ সত্যের দরজা খোলার সময় ঘনিয়ে এসেছে।”

অধ্যায় ৩৩

উত্তরের পাহাড় একদম নীরব।
কোনো পাখি নেই, গাছ নেই, এমনকি বাতাসেরও শব্দ নেই।
সবকিছু থেমে আছে, যেন এই জায়গা এখনও সময়ের বাইরে আটকে আছে।
কদির একা হাঁটছে।
তার পেছনে লুমিয়র, এলিয়ন আর আবির ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, কেউ কিছু বলছে না।
সামনে একটা গহ্বর।
তার নিচে অদৃশ্য এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, যার নাম কেউ জানে না।
তবে পাথর…
অ্যাথারিয়াম, তার ভেতর ধীরে ধীরে আলো বাড়ছে, যেন এই জায়গাটা তার পরিচিত।
কদির নিচে নেমে আসে।
গহ্বরের পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে, আর চোখের সামনে খুলে যায় একটা আদিম, মহাজাগতিক কক্ষ।
দেয়ালে লেখা জ্যোতির্বিদ্যায় মোড়া রুণচিহ্ন, মাঝখানে এক স্ফটিকভরা বেদি, আর বেদির সামনে দাঁড়িয়ে এক সত্তা।
একজন বৃদ্ধ।

তার চোখ বন্ধ, গায়ে ধবধবে সাদা পোশাক, চুল পিঠ পর্যন্ত।
কিন্তু তার মুখে নেই কোনো বয়সের ছাপ।
তিনি ধীরে ধীরে চোখ খোলেন।
“তুমি এসেছো… অনেক দেরিতে, কিন্তু ঠিক সময়ে।”
কদির চমকে ওঠে।
“তুমি কে?”
বৃদ্ধ হেসে ওঠে—ধীর, ভারসাম্যপূর্ণ এক হাসি।
“আমি… অ্যাথারিয়ামের প্রথম বাহক ছিলাম।
আমার নাম কেউ জানে না।
আমি কেবল প্রহরী।”
কদির চুপ করে থাকে।
বৃদ্ধ এগিয়ে এসে তার পাথরের উপর হাত রাখেন।
এক ঝলকে আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, দেয়ালের রুণচিহ্নগুলো জ্বলে ওঠে।
“তোমার ভিতর এই পাথর এক নতুন চুক্তি করেছে।
এখন সময় হয়েছে, তুমি জানো—এটা পাথর না।
এটা এক সত্তা।
এটাই অ্যাথারিয়াম।”
সবাই চুপ।
কদির ধীরে ধীরে পাথরের দিকে তাকায়।
তার বুকের ভেতর কিছু কাঁপছে—না ভয়, না উত্তেজনা…
এটা ছিল স্বীকৃতি।
অ্যাথারিয়াম—সে চুপ করে তার ভিতর থেকে বলে,
“আমি তোকে দেখছি সেই দিন থেকেই, যেদিন তুই প্রথমবার এই ক্রিস্টাল ছুঁয়েছিলি।
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কারণ আমি চাইছিলাম তুই নিজের পায়ে দাঁড়া।
এখন তুই প্রস্তুত।”
এক মুহূর্তে, পাথরটা তার হাত থেকে উঠে যায় বাতাসে।
তা ঘুরতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তার রূপ নেয়।
একটা মহাজাগতিক রঙের পোশাক পরা, চোখে তারার আলো, শরীর জুড়ে ক্রিস্টালের গঠন—এক পুরুষাকৃতি সত্তা দাঁড়ায় তাদের সামনে।
সেই সত্তা কদিরের দিকে তাকিয়ে বলে,
“তোমাদের শত্রু এখনো দূরে নয়।
কিন্তু যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত স্টোভাটর ভেবেছ,
সে স্টোভাটর নয়।"
সবাই অবাক।
লুমিয়র ধীরে ধীরে বলে, “তাহলে… সে কে?”
অ্যাথারিয়াম চোখ বন্ধ করে, তার চারপাশে আলো গুঞ্জন তোলে।
“সে তারই প্রতিচ্ছবি, কিন্তু তার নয়।

অধ্যায় ৩৪

গহ্বরের নিচের সেই মহাজাগতিক ঘরে—নিঃশব্দ।
অ্যাথারিয়ামের দেহে আলো নড়ছে, যেন কোটি নক্ষত্র একসাথে নিশ্বাস নিচ্ছে।
তার কণ্ঠস্বর এবার ভারী, অথচ কোমল:
"আমি অ্যাথারিয়াম।

এক ডাইমেনশনের রক্ষক, যেখানে কল্পনার সব জাদুকর প্রাণীরা বাস করে।
আমি ছিলাম আলো ও ভারসাম্যের বাহক।
আর সে... যাকে তোমরা স্টোভাটর বলে চিনেছ—সে নয়।"
কদির ধীরে ধীরে বলে,
"তবে সে কে?"
অ্যাথারিয়াম ঘুরে দাঁড়ায়।
দেয়ালের রুণগুলো এক এক করে পরিবর্তিত হয়, আর তাতে ফুটে ওঠে এক মুখ—ভয়ঙ্কর, বিকৃত, অথচ পরিচিত।
"তার নাম ছিল না।
সে ছিল ছায়ারই এক প্রতিচ্ছবি।
স্টোভাটর যখন আমার সাথে যুদ্ধ করেছিল, তখন এই ছায়া-সত্তাটি জন্ম নেয় তার ভেতরের লালসা ও দুর্বলতা থেকে।"
লুমিয়র ফিসফিস করে বলে,
"তাহলে আমরা পুরো সময় ভুল দানবের পেছনে ছুটছিলাম..."
"না," অ্যাথারিয়াম বলে, "তোমরা ঠিক পথেই ছিলে।
কারণ সত্য কখনও সরল পথে আসে না।
সে সবসময় ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটে।
এলিয়ন এবার বলে,
"আসল স্টোভাটর কোথায়?"
"সে এখনও ঘুমিয়ে আছে…
তোমাদের এই মহাবিশ্বে নয়, অন্য কোথাও।
এই ছায়া-সত্তা তার প্রতিচ্ছবি ধরে রেখে চলেছে
তাকে জাগাতে।"
কদির এবার সামনে এগিয়ে আসে।
"তুমি যদি এত শক্তিশালী হও, তবে তুমি নিজেই তাকে থামাও না কেন?"
অ্যাথারিয়াম হেসে ফেলে—আলো কেঁপে ওঠে।
"কারণ এ যুদ্ধ আমার নয়।
এটা তোমাদের গল্প।
আমি কেবল তোমাদের পথ দেখাতে পারি,
তোমাদের বেছে নিতে হবে জাগরণ।"
তখনই হঠাৎ গহ্বর কেঁপে ওঠে।
মাটি ফেটে যায়, ছাদে চিড় ধরে।
এক গর্জন—চেনা, কিন্তু আগের চেয়েও গভীর।
"সে চলে এসেছে…" অ্যাথারিয়াম বলে।
এই মুহূর্তেই তোমাদের পরীক্ষা।
তোমরা প্রস্তুত তো?"
চারজন একসাথে মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে যায়।
আবির পায়ের নিচে শীলা জাগায়,
লুমিয়রের চোখে আগুন,
এলিয়নের কাঁধে শক্ত শিলা-ঢাল,
আর কদিরের হাতে আলো-চেইন ঘুরে।
গহ্বরের উপরের ফাটলে দাঁড়িয়ে সেই ছায়াময় ছায়াসত্তা তাকিয়ে আছে।
তার চোখ জ্বলছে।
তার হাসি অন্যরকম।
সে বলে—
"তবে এসো... শেষটা শুরু করি।"

অধ্যায় ৩৫

ছায়া-ফাটল পুরো গহ্বরকে গ্রাস করে ফেলেছে।
তার ভেতর দাঁড়িয়ে সেই ছায়াময় সত্তা—তার মুখে নেই কোনো রাগ, নেই কোনো তাড়া।
শুধু এক অস্বস্তিকর নিশ্চিন্ততা।
"তোমাদের আলো,
তোমাদের প্রতিরোধ—
সবই মূল্যহীন," সে ফিসফিস করে।
কদিরের চোখে এবার আর দ্বিধা নেই।
তার ভিতরে কিছু জেগেছে, পাথর নয়—সত্তা।
অ্যাথারিয়াম পুরোপুরি জেগে উঠেছে তার মধ্যে।
এক ঝলকে, কদিরের শরীর স্ফটিকে ঢেকে যায়—তবে এবার সেটা কেবল বর্ম নয়।
তার চারপাশে বাতাসের কণাও যেন হীরে হয়ে ঘুরছে।
তার দেহ হয়ে গেছে এক জীবন্ত নক্ষত্র, যেখানে আলো চিন্তা করে, আর সময় প্রবাহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
আবির, এলিয়ন আর লুমিয়র—তিনজনেও প্রস্তুত।
তারা জানে, হয়তো এ যুদ্ধ তারা জিততে পারবে না,
তবুও তারা হেরে যেতে আসেনি।
চারজন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ছায়াসত্তার বিরুদ্ধে।
একটা আলোর বিস্ফোরণ,
একটা সময়-বিকৃতি তরঙ্গ,
একটা শিলাস্তম্ভের ছায়া,
আর একটাই চূড়ান্ত ধাক্কা—ভেতর থেকে।
কদির ছায়াসত্তার বুকের গভীরে পাথরটা ঢুকিয়ে দেয়।
এক মুহূর্তে, সবকিছু স্তব্ধ।
আলো নেমে আসে।
গহ্বর ফাঁকা, আর ছায়াসত্তা—তাকে আর দেখা যায় না।
শুধু এক ছায়ার রেখা ধোঁয়ার মতো ভেসে থাকে বাতাসে।
"সে চলে যায়নি," অ্যাথারিয়ামের কণ্ঠ শোনা যায় কদিরের ভিতরে,
"সে শুধু পিছিয়ে গেছে… কারণ তোমরা প্রস্তুত।"
চারজন হাঁপাচ্ছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গহ্বরের কেন্দ্রে।
কদির নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে।
তার মুখে ক্লান্তি, কিন্তু চোখে প্রশান্তি।
"এটাই শেষ?" আবির জিজ্ঞেস করে।
কদির মাথা নাড়ে।
"না।
এটা ছিল একটা পরীক্ষা।
আমরা জিতিনি, কিন্তু আমরা যোগ্য হয়েছি।
এখন আমি অ্যাথারিয়ামের শক্তি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারি।
আর এখন, আমরা জানি সত্যিকারের শত্রু কে—
এবং সে এখনও বেঁচে আছে।"
গহ্বরের বাইরে সূর্য উঠছে।
আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।
তারা সবাই পেছন ফিরে হাঁটতে থাকে।

এই যুদ্ধ শেষ…
তবে যুদ্ধের গল্প নয়।
স্টোভাটর এখনও আসেনি।
আর তার জন্য প্রস্তুতির এই শুরুটুকুই ছিল -

অধ্যায় ৩৫.৫ (পোস্ট-ক্রেডিট অধ্যায়)

সব শেষ ……!
দীর্ঘ পথ, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, বিস্ফোরিত গহ্বর, আলো আর ছায়ার টানাপোড়েন… সব পেছনে ফেলে কদির আর তার সঙ্গীরা অবশেষে ফিরে এসেছে নুরআলমপুরে।
গ্রামের বাতাস এখন অনেক হালকা লাগে।
সূর্য আগের মতোই ওঠে, কিন্তু কদিরের চোখে এই আলো এখন অন্যরকম।
তার ঘরের পাশেই তৈরি হয়েছে দুটো আলাদা কক্ষ—
একটিতে এলিয়ন, আরেকটিতে লুমিয়র।
কদির বলেছিল,
"তোমরা এখানে থাকো , এটা এখন তোমাদের বাড়িও।"
তারা চুপ করে সম্মতি জানিয়েছিল।
আর আবীর?
সে এখন কেবল কদিরের বন্ধু নয়, সহযোদ্ধা।
যার দেহে মহাজাগতিক স্পিডফোর্স আর আত্মায় এখনও স্পন্দন করে যুদ্ধের শিখা।
কয়েকদিন কেটে যায়।
তারপর এক রাত—শান্ত, নিস্তব্ধ।
সবাই ঘুমিয়ে।
কিন্তু কদির একটা স্বপ্ন দেখে।
তাতে সে দাঁড়িয়ে আছে এক অসীম, অন্ধকার মাঠে।
চারদিকে কুয়াশা, কিছুই দেখা যায় না।
তখনই এক অদৃশ্য কন্ঠস্বর ভেসে আসে…
"তুমি জানো না সে কোথায়...
কিন্তু সে ওদিকেই আছে।
তোমার যাত্রা শেষ হয়নি, কদির।
স্টোভাটর এখনও দেখছে।"
কদির হঠাৎ জেগে ওঠে, ঘামে ভিজে।
হাতের কাছে রাখা অ্যাথারিয়ামের পাথরটা হালকা গরম।
পরদিন সকালে—
সে আবীরকে সব জানায়।
আবীর কিছু বলে না, শুধু তার পিঠে হাত রাখে।
“তাহলে আবার যাত্রা?”
কদির মাথা হেঁট করে হাসে।
“এই গল্পটা ছিল প্রথম ধাপ।
এরপর যা আসবে… সেটা নতুন এক অধ্যায়।”
কিছুক্ষণ পর তারা সবাই দাঁড়ায় গ্রামের বাইরে, পূর্ব দিগন্তের দিকে।
এলিয়ন ধীরে বলে,
“গন্তব্য জানা নেই।
তবুও… চলি?”

কদির চোখ তুলে চেয়ে বলে,
“চলি।”
চারজন একসাথে অজানার দিকে হেঁটে যায়।
পেছনে সূর্য ডোবে।
আর সামনে—
নতুন এক মহাজাগতিক গল্পের শুরু।